অসহ্য সাসপেন্স সমগ্র

ভাগ ২

অদ্রীশ বর্ধন

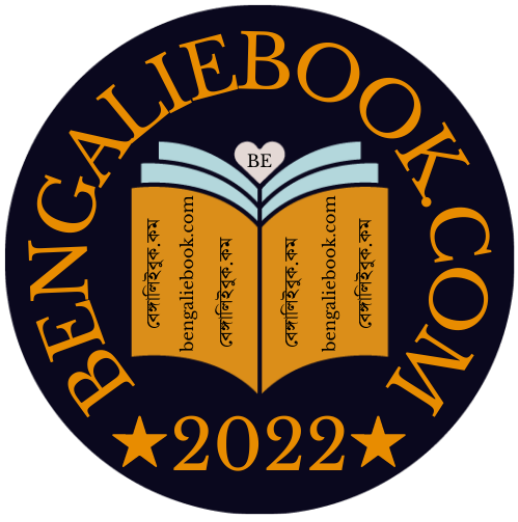

সূচিপত্র

কাঞ্চনপুর-রহস্য.....2

কুরুক্ষেত্র। প্রতুল লাহিড়ী.....26

গন্ধর্বলোক.....36

গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটনের মোতির মালা। হারকুল পয়রট.....57

ঘড়ি বিবি.....65

ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্রনাথ.....74

জিরো জিরো গজানন.....103

জিরো জিরো গজানন রেগেছে.....169

জুয়েল বক্স.....247

দাঁত থাকতে.....253

কাঞ্চনপুর-রহস্য

হত্যা সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ প্রায়ই দেখা যায় ভ্রমাত্মক অথবা আমার মতে, ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিশিষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ সেই সামন্তঘটিত কাহিনিটাই ধরা যাক। সতের বছর আগে ঘটনাটা ঘটেছিল এবং এখনও সে ঘটনা প্রত্যেকের কাছে যেন গতদিনের স্মৃতি–এখনও জনসাধারণ সে কাহিনি নিয়ে গভীর আগ্রহে আলোচনা করে। তবুও যে-কোন দিক দিয়ে বিচার করাই যাক না কেন, কোনও মতেই এটাকে প্রথম শ্রেণির হত্যাপর্যায়ে ফেলা যায় না। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম?

ইন্ডিয়ান কেমিক্যালস কোম্পানির স্বত্ত্বাধিকারী মিঃ কে. ডি. সামন্ত জীবন-সঙ্গিনীরূপে পেয়েছিলেন একজন অতি খিটখিটে এবং বদমেজাজী মহিলাকে। কাজেই তাঁর অন্তরের যে গভীর অনুরাগ স্ত্রীর প্রাপ্য ছিল–সেই অনুরাগের সবটুকুই দিলেন তার সুন্দরী টাইপিস্ট মিস সান্যালকে। আর তারপর তিনি মিসেস সামন্তকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করলেন এবং দেহটিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে কয়লার গাদার নীচে সমাধিস্ত করলেন। প্রাথমিক হলেও এই অবধি ব্যাপারটা করলেন তিনি সুন্দরভাবে; আর এরপর যদি মূর্খ মিস্টার সামন্ত আর কুটোটি না নেড়ে চুপচাপ থাকতেন, তাহলে সুখেই সারা জীবনটা কাটিয়ে ইহলোক ত্যাগ করতেন। কিন্তু কিসের তাগিদে জানি না নির্বোধের মতো তিনি বাড়ি থেকে উধাও হলেন–প্রেমিকার সঙ্গে ছদ্মবেশে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যাত্রা করলেন। এই কাজটি যদি তিনি না করতেন, তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় এই হত্যাটিকে

অতুলনীয় আখ্যা দিতে বিলম্ব করতাম না। পরিণামে কি হল? বেতারের সুযোগ নিয়ে ভারতীয় পুলিশ তাকে জাহাজেই গ্রেপ্তার করলে। এই হত্যা-ঘটিত বিষয়ে এইটুকুই হল সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক–কিন্তু জনসাধারণ এখনও পর্যন্ত এই অপ্রাসঙ্গিকটুকু নিয়েই করছে মাতামাতি। একজন বিখ্যাত চিত্রসমালোচক যখন কোনও চিত্র সম্বন্ধে একটি প্রথম শ্রেণির সমালোচনা করেন, তখন অল্পজনেই তা পড়ে। কিন্তু যেই কোনও সবজান্তা সংবাদদাতা খবর দেয় যে চিত্রশিল্পী ক্যানভাস সাজানোর সময়ে শেক্সপীয়ারের সনেট আবৃত্তি করতে থাকেন অথবা একাহারী হয়ে এই সব বিখ্যাত চিত্র সৃষ্টি করেন–তখনই সমস্ত জগৎ একবাক্যে স্বীকার করে যে, তিনি বড় দরের শিল্পীই বটে।

যা অপ্রয়োজনীয়, তা আর কিছু করতে না পারলেও অকৃত্রিম সত্যটুকুকে চিরকালই অস্পষ্ট করে তোলে। জনতা যদি মিথ্যার পেছনে ধাওয়া করে, তাহলে সত্য তো অবহেলিত হবেই। সুতরাং বুদ্ধিভ্রষ্ট মিঃ সামন্তর জটিল কার্যকলাপ যখন সংবাদপত্র প্রায় ভরিয়ে রেখে দিয়েছে, সেই সময়ে অত্যাশ্চর্য আলিপুর-হত্যা-রহস্যকে স্থান দেওয়া হল কাগজে চক্ষুর অগোচরে ক্ষুদ্র এক কোণে। বাস্তবিকই, খুঁটিনাটি তথ্যগুলি থেকে এমন ভাবে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল যে, এই স্মৃতিতে তা গেঁথে নেই; ঘটনাটা প্রায় এই : আলিপুরের ছোটখাটো একটি ফ্ল্যাটের দোতলায় একজন যুবক একটি অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলছে, অভিনেত্রীর বয়সের সীমারেখা, যতদুর আমার মনে পড়ছে, তিরিশ কি চল্লিশের মধ্যে হবে এবং বিগতযৌবনা হওয়ার পরিণামস্বরূপ চিত্রজগতেও খ্যাতি বিলীন হয়েছে অনেকদিন। কথাবার্তার মাঝখানে আচম্বিতে শোনা গেল একটা ফায়ারিংয়ের শব্দ–খুব কাছ থেকেই। যুবকটি ফ্ল্যাট থেকে ছিটকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল এবং

বাড়ির সদর দরজায় দেখতে পেল একটি মৃত পুরুষকে তার আপন পিতা–গুলি তাঁর বক্ষে বিদ্ধ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, পিতাও এক সময়ে অভিনেতা ছিলেন এবং ওপরতলার অভিনেত্রীটি তার পুরোনো বান্ধবী। কিন্তু তারপরেই আসছে হত্যার অভিনব এবং আশ্চর্য অংশটুকু। মৃতের পাশে অথবা মৃতের হাতে কিংবা মৃতের কোটের পকেটে–আমার ঠিক মনে পড়ছে না কোনওখানে–ভারি তারের তৈরি একটা অস্ত্র পাওয়া গেল–জঘন্য এবং অত্যন্ত সাংঘাতিক এক মারণাস্ত্র, নিখুঁত নৈপুণ্যে অতি অদ্ভুতভাবে গঠন করা হয়েছে সেই বিচিত্র অস্ত্রটি। তখন রাত্রি, কিন্তু প্রতিপদের শুভ্র চন্দ্রকিরণে চতুর্দিক আলোকিত। যুবকটি বললে, একজনকে সে দৌড়ে গিয়ে পাঁচিল টপকে পালাতে দেখেছে।

কিন্তু লক্ষ্য করুন পয়েন্টটি? মৃত অভিনেতা তাঁরই পুরোনো বান্ধবীর ফ্ল্যাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন, অন্তরালে থেকে অপেক্ষা করছিলেন, হাতে ছিল তার সেই নির্মম অস্ত্রটি। তিনি কোনও শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার প্রত্যাশায় ছিলেন। যাকে খুন করবার অভিপ্রায় না থাকলেও যার মারাত্মক অনিষ্টের অভিপ্রায় নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

কে সেই শত্রু? মৃত ব্যক্তির বর্বর ও সুচিন্তিত অভিপ্রায়ের চেয়েও দ্রুতগামী ওই বুলেটটি কার দ্বারা নিক্ষিপ্ত?

খুব সম্ভব আমরা কোনওদিন তা জানতে পারব না, যে হত্যা প্রথম শ্রেণির পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার উপযুক্ত ছিল, যে হত্যা বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার দিক দিয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি

করতে পারত, সেই হত্যাই বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যেতে বাধ্য হল–মূর্খ জনতা ততধিক মূর্খ সামন্ত আর তার প্রেমিকাকে নিয়ে সৃষ্টি করলে বছরব্যাপী আলোচনার।

স্বভাবতই এই ধরনের অবহেলার জন্য যুদ্ধ অনেকাংশে দায়ী। সেই আতঙ্কভরা দিনগুলিতে মানুষের মাথায় শুধু একটি চিন্তাই জাগ্রত ছিল–বাদবাকি সব হয়েছিল উপেক্ষিত। সুতরাং ঢাকুরিয়া লেকে যত্ন করে বস্তায় জড়ানো মৃত মহিলাটির বিকৃত দেহটির ওপর খুব অল্পই মনোযোগ দেওয়া হল এবং বেশি বাগাড়ম্বর না করে একটি লোককে ফাঁসিতে দেওয়া হল ঝুলিয়ে। এ কেসে দু-একটি চিত্তাকর্ষক পয়েন্ট প্রত্যেকেরই দৃষ্টি গেল এড়িয়ে।

আর, তারপর শোনা গেল ভবানীপুরে এক আশ্চর্য হত্যা-কাহিনি। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার একটা বড় বাড়িতে নতুন ভাড়া এলেন। তখনও তাঁদের সমস্ত মালপত্র খোলা হয়নি–একরাত্রে গৃহকর্তাকে কে খুন করে কয়েকটি জিনিস নিয়ে সরে পড়ল। লুণ্ঠন সামগ্রীর মধ্যে ছিল কী? একজোড়া বুট জুতো, খুব জোর, পনের টাকার বেশি দাম হওয়া উচিত না। আর একটি ঘড়ি–সেটার দামও পঁচিশ টাকার ওদিকে নয়। এক্ষেত্রেও হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে বিনাবাক্যব্যয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। আর বলতে বাধ্য হচ্ছি, তার গতিবিধির যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু যুদ্ধপূর্ব অথবা যুদ্ধকালীন যাবতীয় কেসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ যে কেসটি লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেছিল, সেটি হল কাঞ্চনপুর-রহস্য। অশ্রুতপূর্ব এই কাহিনি শোনাবার আগে প্রথমেই আমি কাহিনির ঘটনাস্থান ও পাত্রপাত্রীর নাম পরিবর্তনের অবাধ অনুমতি পাঠকের কাছ থেকে চেয়ে

রাখছি। কারণ, এই কাহিনি সম্পর্কিত ব্যক্তিরা কোথায় বর্তমান আছেন, তা জানি না, জীবিত কি মৃত, তাও জানি না। সুতরাং পূর্ব থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে করে এইটুকু অধিকার আমি চেয়ে নিলাম। সংবাদপত্রে যখন এই কাহিনির ছোট্ট একটি শিরোনামা প্রকাশিত হল, তখন অতি ব্যস্ত জগতের নজরই পড়ল না সেদিকে। সংবাদপত্র মারফৎ উজবেক শিল্পীদের নৃত্যকলা প্রদর্শন বা নিখিল ভারত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলন বা ওই জাতীয় কিছু বৈচিত্র্যময় সংবাদ পরিবেশিত হত কিনা মনে নেই, হলেও জনগণ তখন সে সংবাদ রাখার চেয়ে ট্যাঙ্কার, ভি-টু অথবা প্যারাসুট বাহিনীর খবরটাই জেনে রাখা উচিত বলে মনে করত।

কাঞ্চনপুরের রহস্যের সূত্রপাত হয় এইভাবে। প্রথমেই ধরে নেওয়া যাক যে কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে অতি মনোহর ক্ষুদ্র একটি কলোনি আছে–মনে করা যাক, সেই সুসজ্জিত কলোনিটার নাম কাঞ্চনপুর। ক্ষুদ্র হলেও প্রয়োজনীয় কিছুরই অভাব সেখানে রাখা হয়নি। থানা, বাজার, পোস্টাফিস ইত্যাদি যাবতীয় সুবিধাই সেখানে সহজ লভ্য। শহরের উপকণ্ঠে থাকায় যাতায়াতেও কোনও অসুবিধা নেই–ট্রাম, বাস এবং ট্রেন, এই ত্রিবিধ যানই যাতায়াতের পথকে সুগম করে তুলেছে। এ হেন কাঞ্চনপুরে চৌরাস্তা থেকে স্টেশনের বিপরীত দিকের পথটায় মিনিট তিনেক হেঁটে গেলে লাল পয়েন্টিং করা যে দোতলা বাড়িটা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে বাস করতেন জগদীশ সরকার এবং তাঁর স্ত্রী। প্রাচীন দুর্গফটকের মতো লোহার বড় বড় কীলক মারা সদর দরজার ওপরেই একটা চকচকে আমার প্লেটে লেখা আছে, Taxidermist : Skeletons Articulated মৃত জন্তুজানোয়ারের চামড়া অবিকৃত রেখে ভেতরে শুষ্ক জিনিস ঠেসে কৃত্রিম জীবন্ত-

দর্শন জানোয়ার তৈরির আর্টকেই Taxidermy বলে। এর বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। জগদীশ সরকার শুধু যে এই শিল্পতেই দক্ষ ছিলেন তা নয়, তিনি বিভিন্ন অস্থির জোড়া লাগিয়ে কঙ্কাল নির্মাণেও সমান পারদর্শী ছিলেন। তার বাড়ির পেছনে ছিল ছোট্ট একফালি বাগান–এই বাগানের একপ্রান্তে জগদীশ সরকার নির্মাণ করেছিলেন ছোট্ট কারখানাটি তাঁর যন্ত্রপাতি থাকত এইখানেই। নিভৃতে প্রতিবেশীদের সাদা-অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর অন্তরালে তিনি তাঁর শিল্প নিয়েই দিনের পর দিন যেতেন কাটিয়ে।

যতদূর জানা গেছে, এই অস্থি সংযোজনকারী ট্যাক্সিডারমিস্ট ভদ্রলোকটি নিতান্ত নিরীহ এবং নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। প্রতিবেশীরা এই ছোটখাটো মানুষটিকে পছন্দ করতেন। পাশের বাড়ির সরকারি চাকুরে অময়বাবু, মোড়ের স্টেশনারি দোকানের স্বত্ত্বাধিকারী হরিহরবাবু এবং আরও দুজন ভদ্রলোক সুখেন্দু দাস আর রবিপ্রসাদ মুখার্জি–এঁরা সবাই জগদীশ সরকারের বৈঠকখানায় বহু বিকেল দাবা খেলে, চা পান করে এবং গল্প করে কাটিয়ে গেছেন। যুদ্ধপূর্ব শান্তির দিনে বহুবার এই কজন নিরীহ ভদ্রলোক ইডেন গার্ডেনে বেরিয়েছেন এবং গঙ্গার ঘাটে সূর্যাস্ত দেখেছেন।

তাঁদের কেউই খুব বেশি কথা বলতে ভালোবাসেন না এবং একমাত্র বিকাল ছাড়া কখনই একত্রে বাজে সময় নষ্ট করা পছন্দ করতেন না। বৈঠকখানায় তারা নীরবে বসে দাবা খেলতেন, দু-একটি কথা বলতেন আর না হয় শান্ত দৃষ্টি মেলে দেওয়ালে প্রলম্বিত সোনালিফ্রেমে বাঁধান রবীন্দ্রনাথের ছবিটা দেখতেন। অথবা বড় টেবিলটার ওপর রক্ষিত দুটি লালাভ প্রায়-জীবন্ত কুকুরের মধ্যস্থিত অদ্ভুত দর্শন ঘড়ির দোদুল্যমান পেণ্ডুলামটি

নির্নিমেষ চোখে লক্ষ্য করতেন। জগদীশবাবু এই শান্ত পরিবেশের কেন্দ্রস্থল ছিলেন–তার স্মিত বদন এবং সৌম্যমূর্তি দিয়ে এই কজনের মনকে তিনি একেবারেই জয় করে নিয়েছিলেন। জগদীশবাবুর স্ত্রী ছিলেন যেমন কটুভাষিণী, তেমনই তীব্র-স্বভাবা। এই শান্তি-চক্রের পাঁচজন সভ্যই তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। প্রতিবেশিনীরাও জগদীশ-গিন্নি সম্বন্ধে ছিলেন শঙ্কিত। নির্বিরোধী জগদীশবাবুর জীবন তিনি বিষিয়ে তুলেছিলেন। লৌহকীলক মারা মজবুত দরজা ভেদ করেও তীক্ষ্ণ বামা-কণ্ঠ প্রতিবেশীদের সচকিত করে তুলত–একবার শুরু হলে যে পর্যন্ত না দম ফুরিয়ে আসত, জগদীশবাবুর প্রতি কণ্ঠনিঃসৃত সেই বিষেণচাঁদগার আর থামতে চাইত না; আর বেচারি জগদীশবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে আসতেন–কেননা রসনার চেয়েও কার্যকরী আরও কিছুর আশঙ্কা তিনি করতেন।

কুখ্যাত এই মহিলাটি ছিলেন শ্যামবর্ণা, মধ্যমাকৃতি, কুঞ্চিতকেশী। নিমফুল খেলে মুখের ভাব যেরকম হয়, তার মুখে সর্বদাই সেই ভাব থাকত ফুটে। তিনি হাঁটতেন দ্রুতগতিতে, কিন্তু বেশ একটু খুঁড়িয়ে। তাঁর অন্তরের তেজ ছিল প্রচুর–প্রতিবেশীদের কাছে তিনি ছিলেন একটি মূর্তিমান উৎপাত আর হতভাগ্য জগদীশবাবুর কাছে তিনি ছিলেন উৎপাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

রণ-দামামা বেজে ওঠার পর ইডেন গার্ডেনে ও গঙ্গার ধারে এই কজন শান্ত-পরিবেশ-প্রিয় ভদ্রলোকের বৈকালিক ভ্রমণটা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল এবং তাঁদের নিবিড় স্বাচ্ছন্দ্যানুভূতিরও ব্যাঘাত ঘটল প্রচুর। তা সত্ত্বেও এই শান্তি-চক্রের বৈকালিক

অধিবেশন পুরোপুরি ভাবে স্থগিত রইল না এবং এক সন্ধ্যায় জগদীশবাবু ঘোষণা করলেন যে তাঁর স্ত্রী এলাহাবাদে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন এবং খুব সম্ভবত বেশ কিছু সময়ের জন্য আর ফিরবেন না।

ওখানেও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য খুব বেশি লোক না গেলেও, অময়বাবু বললেন, আমার একবার যথেষ্ট উপকার হয়েছিল।

অপর কয়েকজন কিছু বললেন না। কিন্তু অন্তরের সঙ্গে জগদীশবাবু জানালেন অভিনন্দন। তাঁদের মধ্যে একজন পরে মন্তব্য করেছিলেন যে জগদীশবাবুর স্ত্রীর পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে বৈতরণীর ওপারে এবং সকলেই তাতে একমত হয়েছিলেন। তখন তারা কেউই জানতেন না যে প্রস্তাবিত চিকিৎসার সকল সুবিধাই সে সময় জগদীশগিন্নি উপভোগ করছিলেন।

যতদূর মনে পড়ছে, জগদীশ-গিন্নির এক ভগ্নি, অন্নপূর্ণা মিত্রের আবির্ভাবের পর থেকেই জগদীশবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই মহিলাটি ছিলেন তাঁর ভগ্নির মতো প্রায় একই রকম বদমেজাজী এবং সন্দিগ্ধমনা। একটি অভিজাত পরিবারের নার্স হয়ে কয়েক বছর তিনি ব্রহ্মদেশে বাস করছিলেন। তারপর পরিবারটি কলকাতায় ফিরে এলে, তিনিও সেই সঙ্গে কলকাতায় চলে এলেন। প্রথমে এই মহিলাটি তাঁর ভগ্নিকে খান দু-তিন চিঠি লিখেছিলেন, কোনও উত্তর পাননি। এইখানেই তাঁর কীরকম খটকা লাগল, কেননা জগদীশ-গিন্নি পত্র-লেখিকা হিসাবে বড় নিয়মিত ছিলেন এবং প্রতি পত্রই তার স্বামী

সম্বন্ধে নোংরা কথায় পরিপূর্ণ থাকত। সুতরাং কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরের সন্ধ্যাতেই অন্নপূর্ণা মিত্র সশরীরে এসে হাজির হলেন বোনের মুখে প্রকৃত সত্যটুকু জানতে। জগদীশবাবু চিঠিগুলো যে সরিয়ে ফেলেছেন, এ বিষয়ে তার আর কোনও সন্দেহই ছিল না। প্রায়ই বিড় বিড় করে তাঁকে বলতে শোনা যেত, হতভাগা জানোয়ার; মজা আমি দেখাব তোমায়! আর তাই কাঞ্চনপুরে এসে হাজির হলেন অন্নপূর্ণা মিত্র–এসেই কারখানা থেকে টেনে বের করলেন জগদীশবাবুকে। মহিলাটিকে দেখবামাত্র বেজায় দমে গেলেন জগদীশবাবু। চিঠিগুলো তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় ফিরে আসাটা এমন আকস্মিক যে আগে থেকে খবর না পাওয়ায় তিনি প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেননি। যাই হোক, মিস্ মিত্র এ সম্বন্ধে একটি কথাও বললেন না। জগদীশবাবু ভেবেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর এই বোনটি অন্তত আরও দশ-কুড়ি বছর সুদূর ব্রহ্মদেশে বাস করতে থাকবেন-ইতিমধ্যে নাম পরিবর্তন করে বছর খানেকের মধ্যে তিনিও সরে পড়বেন। আর তাই আচম্বিত মিস মিত্রকে সামনে দেখে তিনি গেলেন দারুণ দমে।

অন্নপূর্ণা মিত্র সোজা কাজের কথা পাড়লেন।

কমলা কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ওপর তলায়? ঘণ্টা বাজানোর পর, দরজায় কড়া নাড়ার পর তার তো নেমে আসা উচিত ছিল।

না। জগদীশবাবু বললেন। তার গোপন রহস্য নিয়ে তিনি যে গোলকধাঁধার সৃষ্টি করছেন, তার কথা চিন্তা করে তিনি স্বস্তি বোধ করলেন; এই গোলকধাঁধাঁর ঠিক কেন্দ্রস্থলে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ? না, সে ওপরতলায় নেই সে বাড়ি নেই।

ও তাই নাকি? বাড়িতে নেই? তাহলে নিশ্চয় কোনও বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে? কখন ফিরবে বলে মনে হয় আপনার?

সত্য কথা বলতে কি অন্নপূর্ণা, সে আর ফিরবে বলে আমি আশা করি না। আমাকে সে ছেড়ে গেছে–তিন মাস আগে সে চলে গেছে।

এই কথা আমায় বলতে চান আপনি! আপনাকে ছেড়ে গেছে। তার সঙ্গে কী ব্যবহারটা তাহলে করেছিলেন? কোথায় গেছে সে?

বিশ্বাস কর অন্নপূর্ণা, আমি জানি না। একদিন সন্ধ্যায় আমাদের মধ্যে একটু ঝগড়া-ঝগড়ি হল, কিন্তু তা নিয়ে আমি বেশি কিছু ভাবিনি। কিন্তু সে বললে যে যথেষ্ট হয়েছে, বলে কয়েকটি জিনিস গোছ-গাছ করে ব্যাগে পুরে বেরিয়ে গেল। আমি পিছু পিছু অনেকটা ছুটে গেলাম, বার বার মিনতি করে বললাম ফিরে আসতে–কিন্তু সে একবারও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে না–সোজা স্টেশনের দিকে চলে গেল। আর সেই দিন থেকে তাকে আর দেখিও নি, তার কথাও শুনিনি। আর যত চিঠি এসেছে, সব আমি পোস্ট-অফিসে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি।

ভগ্নিপতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অন্নপূর্ণা মিত্র। দোষটা কার, কমলার না জগদীশবাবুর–এই নিয়ে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, সবশেষে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। আর জগদীশবাবু ফিরে গেলেন কারখানায়। কয়েকটি ময়ূর ঠাসা বাকি ছিল, সেইগুলো সেরে ফেলতে! আবার তিনি সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের জন্য তার বুকের স্পন্দন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল–আশঙ্কা করেছিলেন তাঁর গোলকধাঁধার রহস্য বুঝি গেল ফাঁস হয়ে। কিন্তু তারপরে আবার ফিরে এল তাঁর চিত্তের শান্তি।

এর পর সব কিছু মোটামুটি মানিয়ে যেত, যদি না চৌমাথার কাছে অন্নপূর্ণা মিত্রের সঙ্গে রেবা রায়ের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হত। রেবা রায় সরকারি চাকুরে অময়বাবুর স্ত্রী। ইতিপূর্বে জগদীশবাবুর বাড়িতে দুজনের আলাপ হয়েছিল–কাজেই দেখামাত্র দুজনেই দুজনকে চিনতে পারলেন। কয়েকটি বাজে কথার পর মিস্ মিত্রকে রেবা রায় জিগ্যেস করলেন যে কলকাতায় ফেরবার পর ইতিমধ্যে তার বোনের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন কিনা।

সে যে কোথায় তাই যখন জানি না, তখন কী করে আমার সঙ্গে তার দেখা হতে পারে? বেশ কিছুটা উন্মা প্রকাশ করে মিস মিত্র উত্তর দিলেন।

কী মুসকিল, আপনি তাহলে জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা করেননি?

এই মুহূর্তে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসছি।

কিন্তু তিনি তাহলে নিশ্চয় এলাহাবাদের ঠিকানাটা ভুলে যেতে পারেন না?

আর এইভাবে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গড়িয়ে গেল কথাবার্তার গতি এবং মিস মিত্র পরিষ্কার জানতে পারলেন যে জগদীশবাবু তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলেছেন যে তার স্ত্রী অনেক দিনের জন্য এলাহাবাদে আত্মীয়-স্বজনের কাছে বেড়াতে গেছেন। প্রথমত মিত্র-ভগ্নিদ্বয়ের কোনও আত্মীয়ই এলাহাবাদে থাকত না–তাদের আদিবাস ছিল ময়মনসিংহে, আর দ্বিতীয়ত, জগদীশবাবু তাঁকে বলেছেন, কমলা ক্রুদ্ধ হয়ে বাড়ি ছেড়ে কোথায় বেরিয়ে গেছেন তা তিনি জানেন না। প্রথমে মিস মিত্র ভাবলেন এখুনি ফিরে গিয়ে ভগ্নিপতিকে এক হাত নেবেন–তারপর তিনি মত পরিবর্তন করলেন। দেরি হয়ে যাচ্ছিল, কাজেই তৎক্ষণাৎ আর দেখা না করে তিনি কলকাতাতেই ফিরে গেলেন,–সারাপথে কি ভাবে জগদীশবাবুকে শায়েস্তা করবেন, সেই কথাই লাগলেন ভাবতে।

পরের হপ্তায় আবার তিনি আবির্ভূত হলেন কাঞ্চনপুরে। কাঁচা মিথ্যা কথনের অপরাধে তিনি জগদীশবাবুকে অভিযুক্ত করলেন তাঁর সামনে ধরে দিলেন দুটি বিভিন্ন কাহিনি। আর, আবার আগের মতো জগদীশবাবুর বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ভয়ানক আতঙ্কে হাত-পা প্রায় অবশ হয়ে আসার উপক্রম হল। কিন্তু তার সংযম নিতান্ত অল্প ছিল না।

সত্যিই, তিনি বললেন, আমি তোমায় কোনও মিথ্যেই বলিনি অন্নপূর্ণা। ঠিক যা ঘটেছে তোমায় বলেছি। কিন্তু এখানকার লোকদের জন্যে এলাহাবাদের ওই কাল্পনিক গল্পটা আমায় বানাতে হয়েছিল। এ বিষয় নিয়ে প্রত্যেকে আলোচনা করুক, এ ইচ্ছা আমার ছিল না–বিশেষ করে কমলার ফিরে আসার সম্ভাবনা যখন রয়েছে–আমার তো মনে হয় আর কিছুদিনের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।

সন্দেহপূর্ণ চোখে মুহূর্তের জন্য মিস্ মিত্র জগদীশবাবুকে এক দৃষ্টে লক্ষ্য করলেন আর তারপরেই দ্রুতপদে উঠে গেলেন দোতলায়। কিন্তু অচিরেই তিনি নেমে এলেন।

কমলার ড্রয়ার আমি দেখে এলাম। এমন ভাবে তিনি কথা শুরু করলেন যেন জগদীশবাবুকে যুদ্ধে আহ্বান করছেন। অনেকগুলো জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। চুণীর লকেট বসান নেকলেশটা নেই, কৃষ্ণার দেওয়া হীরার আংটিটাও দেখতে পেলাম না, কানপাশা, চুড়ি আর তাগাও দেখতে পেলাম না।

কমলা চলে যাবার পর আমি ওর সব কটা ড্রয়ারই বাইরের দিকে খুলে ঝুলতে দেখেছি। নিশ্বাস ফেললেন জগদীশবাবু। আমার বিশ্বাস, সে যাবার সময়ে সব গয়নাই নিয়ে গেছে।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে জগদীশবাবু প্রতিটি ছোটখাটো বিষয়ের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন–এ গুণটি বোধহয় তাঁর শিল্প-দক্ষতা থেকেই জন্মেছিল। তিনি বুঝতে

পেরেছিলেন যে যাবার সময়ে স্ত্রী যাবতীয় অলঙ্কার ফেলে চলে গেছে–এ গল্প কেউই বিশ্বাস করবে না। আর কাজেকাজেই যাবতীয় অলঙ্কার-সম্পত্তি গেল অদৃশ্য হয়ে।

প্রকৃত পক্ষে, এ ক্ষেত্রে কি যে আর করা উচিত, তা মিস্ মিত্র আর ভেবে উঠতে পারলেন না। দুটি বিভিন্ন রকমের কাহিনি বলার তাৎপর্য জগদীশবাবু এমন সুন্দরভাবে যুক্তির সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সে যুক্তি তিনিও না মেনে পারেননি। সুতরাং জগদীশবাবু যে যে-কোনও কৃমি-কীট মনুষ্যের চেয়েও জঘন্য–এই পরম সত্যটুকুই তাকে জানিয়ে দিয়ে তিনি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে প্রস্থান করলেন। পুনরায় দ্রুত-স্পন্দিত বক্ষ নিয়ে জগদীশবাবু ফিরে গেলেন তাঁর কারখানায়। গোলকধাঁধা তখনও নিরাপদ, রহস্য তার অনাবিষ্কৃত। দ্বিতীয়বার আবার যখন মিস্ মিত্রের অগ্নি-মূর্তির সম্মুখীন তিনি হলেন, প্রথমটা তাঁর হৃৎপিণ্ডটা বড় বেশি রকম লাফালাফি করছিল–কিন্তু এখন বুঝলেন এ আতঙ্ক সম্পূর্ণ আকার বিহীন। তার কোনও বিপদ আর নেই। আমাদের মতো তিনিও তখন ভাবলেন সামন্ত ঘটিত মামলার বিবরণটি। সামন্ত দৌড়োদৌড়ি করছিলেন বলেই ধ্বংস হয়ে গেলেন। যদি সামন্ত চঞ্চল না হয়ে এক স্থানে জেঁকে বসে থাকতেন, তাহলে তার কেশাগ্র স্পর্শ করবার সাহস কারও হত না এবং কয়লার গাদার নীচে সমাধিও কোনওদিন হত না আবিষ্কৃত। জগদীশবাবু অবশ্য মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে সন্দিগ্ধমনা যে কোনও ব্যক্তি আসুক তার গৃহে, খুঁজে দেখুক প্রতিটি কোণ, চোর-কুঠরি এবং কয়লার গাদা। বাগানের প্রতিটি ফুলগাছের মাটি খনন করুক, প্রতিটি দেওয়াল ভেঙে তন্নতন্ন করে দেখুক। এই কথাই ভাবতে-ভাবতে তিনি তুলে নিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ

একটি দাঁড়কাক। সকালের দিকে এ অর্ডারটি এসেছিল–সমস্ত মন নিবিষ্ট করে তিনি কৃষ্ণ-প্রাণীটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

ভগ্নীর অসাধারণ অন্তর্ধান রহস্যের সংবাদ বহন করে মিস মিত্র ফিরে এলেন কলকাতায় আর ক্রমাগত চিন্তা করতে লাগলেন। আগাগোড়া বিষয়টা বারংবার তোলপাড় করেও তিনি চিন্তার কোনও কূল-কিনারা পেলেন না। তিনি জানতেন না যে এরকম ভাবে নানা কারণে বহু নারী এবং পুরুষ উধাও হয়ে যায় প্রতি বছরে–কেউই তাদের সন্ধান পায় না, যে পর্যন্ত না দৈব এসে কল-কাঠি নেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু কী জানি কেন, মিস্ অন্নপূর্ণা মিত্রের কাছে এই ব্যাপারটি মনে হল একটি রীতিমতো অলুক্ষুণে, বিস্ময়-জনক, অতুলনীয় এবং ভয়াবহ ঘটনা। অনবরত এই বিষয় নিয়ে ভেবে ভেবে তিনি মাথা গুলিয়ে ফেললেন, তবুও স্বল্প-বা জগদীশ সরকার যে গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছেন, তার প্রবেশ পথেরই হদিশ পেলেন না খুঁজে। অবশ্য ভগ্নিপতি সম্বন্ধে মিস্ মিত্রের কোনও সন্দেহ ছিল না। কেননা তার ব্যবহার এবং কথাবার্তা খুবই সরল, স্পষ্ট এবং অতীব বোধগম্য। তিনি একজন কৃমি-কীট–এই সংবাদ তাকে জানিয়ে দিয়েছেন–কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অবশ্যই সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু মিস্ মিত্র তার একমাত্র বোনটিকে ভালোবাসতেন। এবং কমলা সরকার কোথায় গেছেন এবং তাঁর কী হয়েছে–এই সংবাদ জানার জন্যে তিনি আকুল হয়ে উঠলেন। আর তাই সর্বশেষে তিনি পুলিশের সমীপে এই ঘটনাটি হাজির করলেন।

অন্তর্হিত মহিলার যতটুকু বর্ণনা সম্ভব, মিস্ মিত্র স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে তা দিতে কসুর করলেন না; কিন্তু এই কেসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি মিস্ মিত্রের দৃষ্টি একটি বিষয়ে আকর্ষণ করলেন–যেহেতু তিনি তাঁর ভগ্নীকে বহু বছর যাবৎ দেখেননি, অতএব এ ক্ষেত্রে জগদীশ সরকারের পরামর্শ অপরিহার্য। সুতরাং পুনরায় শিল্পকর্ম থেকে টেনে আনা হল ট্যাক্সিড়ারমিসট ভদ্রলোককে। মিস্ মিত্রের আনা সংবাদটুকু এবং তার দেওয়া কমলা সরকারের দৈহিক বর্ণনার ওপর ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। তিনি আর একবার তার ছোট্ট জটিলতাবিহীন গল্পটি বললেন, বিশ্রী কানাঘুষো এড়াবার জন্যে প্রতিবেশিদের কাছে কেন মিথ্যা বলেছেন–সে কথারও উল্লেখ করলেন এবং সর্বশেষে মিস্ মিত্র বর্ণিত কমলা সরকারের ফটোগ্রাফে নিজেরও দু-একটি খুঁটিনাটি পরিবর্তন সংযোজন করে দিলেন। তারপর তিনি কনস্টেবলটিকে দুটি ফটোগ্রাফ দিলেন। ফটো দুটির মধ্যে যে যে স্থানে সাদৃশ্য চোখ এড়ায় না, সেগুলিও তর্জনী নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন এবং তারপর প্রসন্ন-বদনে স্মিতহাস্যে তাকে দিলেন বিদায়।

পুলিশের জোর তদন্ত চলল–Missing Squad ফটোগ্রাফ দুটি নিয়ে সম্ভব অসম্ভব সব জাতীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গেই দেখতে লাগল মিলিয়ে। কিন্তু তা হতোস্মি! মিস্ মিত্র যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রইলেন। তখন তিনি নিজেও নিজের প্রচেষ্টা আর অর্থ নিয়োগ করে অনুসন্ধানকে ব্যাপকতর করে তুললেন; প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই ফটো সহ নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন ছাপা হল–কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল আর ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন মিস অন্নপূর্ণা মিত্র। সবশেষে পুলিশের সঙ্গে এবং আরও কয়েক জনের সঙ্গে পরামর্শ করে দেওয়াল-বিজ্ঞাপন ছাপালেন এবং

কাঞ্চনপুর ও শহরের সর্বত্র দিলেন ছড়িয়ে। শহরের বাইরেও কিছু গেল। বাড়ির দেওয়ালে, গাছের গুঁড়িতে, পার্কের বেঞ্চে–সর্বত্র দেওয়াল প্রলম্বিত শ্রীমতী কমলা সরকারের ফটোগ্রাফ বহু পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল–এ সেই ফটোগ্রাফ যেটি জগদীশবাবু নিজে নগর-রক্ষীবাহিনীর হাতে দিয়েছেন তুলে, সেই সাথে তার দেওয়া বিশদ দৈহিক বর্ণনাও হয়েছে মুদ্রিত বর্ণনার মধ্যস্থানে লেখা আছে বেশ একটু খুঁড়িয়ে চলেন–এই কয়টি শব্দ মোটা মোটা হরফে ছাপা। প্লাকার্ডের ফল কিছু দেখা গেল না–কিছুই চাঞ্চল্যকর সংবাদও এল না। শেষবারের মতো তাঁকে কাঞ্চনপুর স্টেশনের দিকে যেতে দেখা গেছে–এই বিবৃতিও সরকারি গোয়েন্দার কাছে খুব আশাজনক সূত্র বলে মনে হল না। এ ব্যাপারে কোনও ইঙ্গিতও সংবাদপত্রে হল না প্রকাশিত; আর তারপর ধীরে ধীরে আমরা আবার নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত সম্মুখ-রণাঙ্গনের চাঞ্চল্যকর বিবরণে হয়ে গেলাম মগ্ন। একটি মুখরা স্ত্রীলোকের গতিবিধি নিয়ে আলোচনা করবার মতো অবকাশ আমাদের আর কারুরই রইল না–কাঞ্চনপুর কলোনিও তাঁর কথা বিস্মৃত হয়ে এল ধীরে ধীরে।

আর তারপর হল এই রহস্যের উপসংহার এবং সেটা নিছক দৈবঘটিত ছাড়া আর কিছুই নয়। কাঞ্চনপুর কলোনির একপ্রান্তে অবস্থিত একটি দ্বিতল ভবনের দোতলায় ততোধিক নির্জন এক কক্ষে অলস মধ্যাহ্নে পদচারণা করছিলেন শ্রীকান্ত মিত্র–একজন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট। হাতে বিশেষ কোনও কাজ ছিল না এবং পড়াতেও বিশেষ মন বসছিল না। কাজেই উদাসীন এবং অলস ভঙ্গিমায় তিনি জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারে দোকানের সাইনবোর্ডটি লক্ষ্য করলেন, রাস্তার মোড়ে দুটি ছোট মেয়েকে দেখলেন বেণী দুলিয়ে

স্কুলে যেতে। তারপর দেখলেন এক স্থূলাঙ্গী মহিলা বহুকষ্টে রিক্সা থেকে নেমে প্রবেশ করলেন পার্শ্ববর্তী দোকানে। তখন তিনি শো-কেসের মূল্যবান হস্তীদন্ত নির্মিত নটরাজের মূর্তির শিল্পকৌশল দেখলেন, এবং ভাবলেন যে এরকম একটি মূর্তি কিনে তার পড়ার টেবিলে সদ্যক্রীত মড়ার মাথার খুলি ওপর রেখে দিলে কীরকম দেখাবে; আর তারপর তার ভ্রাম্যমান দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে এসে স্থির হল পথপার্শ্বের একটি গাছের মোটা গুঁড়ির ওপর; গুঁড়িটির ওপরে দুটিমাত্র শাখা ঠিক ইংরাজি Y-এর মতো উর্ধে উঠে গেছে। এই দুটি শাখার সংযোগস্থলে দেখতে পেলেন একটি নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন এবং কমলা সরকারের দৈহিক বর্ণনা।

বেশ একটু খুঁড়িয়ে চলেন।

শ্রীকান্ত মিত্রের শ্বাস-প্রশ্বাস মুহূর্তের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল। জানলার একটি গরাদ চেপে ধরে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আর একবার ওই বিস্ময়কর শব্দগুলি পড়লেন। আর তারপর তিনি সোজা হাজির হলেন কাঞ্চনপুর পুলিশ ফাঁড়িতে।

ব্যাপারটা এই : কমলা সরকারকে শেষবার দেখা যাওয়ার তিন হপ্তা পরে শ্রীকান্ত মিত্র জগদীশ সরকারের কাছ থেকে কিনেছিলেন একটি স্ত্রী-নরকঙ্কাল। উরুর একটি হাড়ের গঠন বিকৃত থাকার ফলে তিনি কঙ্কালটি খুব সুবিধা দরেই পেয়েছিলেন। আর এখন তাঁর আচম্বিতে মনে হল যে কঙ্কালের ভূতপূর্ব অধিকারিণী একসময়ে নিশ্চয় বেশ একটু খুঁড়িয়ে চলতেন।

মামলা চলার সময়ে সোমদেব চৌধুরি তাঁর সুনাম বজায় রাখলেন। জমকালো বাগ্মীতার সাহায্যে তিনি জগদীশ সরকারের পক্ষ সমর্থন করলেন। আমি আদালতে ছিলাম–সে সময়ে প্রায় আদালতে যাওয়া আমার অন্যান্য কাজের অন্যতম ছিল এবং কয়েদির পক্ষাবলম্বন করে তিনি প্রথমেই বাকপটুতায় যে নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, তা আমি কোনওদিন ভুলব না। ধীরে-ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সমস্ত আদালত-গৃহের চতুর্দিকে বুলিয়ে নিলেন তাঁর মসৃণ চক্ষু। সর্বশেষে তার গাম্ভীর্যময় প্রশান্ত দৃষ্টি স্থির হল জুরির ওপর। অনেকক্ষণ বাদে কথা শুরু করলেন তিনি। মৃদু, স্পষ্ট ও সতর্ক তাঁর স্বর, প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করবার পূর্বে যেন মনে মনে গুঞ্জন করে নিয়ে তবে বলছেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, তিনি শুরু করলেন, একজন অত্যন্ত মহান্ পুরুষ এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান পুরুষ এবং অত্যন্ত সৎ পুরুষ একবার বলেছিলেন যে, সম্ভাবনাই হল জীবনের পথপ্রদর্শক। এটা যে একটি রীতিমতো অর্থব্যঞ্জক বাক্য, এ সম্বন্ধে, আমার বিশ্বাস, আপনারা নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন। বিশুদ্ধ গাণিতিক পরিধি একবার আমরা অতিক্রম করে এলে যা পাই–তার মধ্যে অতি অল্পই থাকে নিশ্চিত। ধরা যাক, লগ্নী করার মতো যথেষ্ট অর্থ আমাদের আছে : প্রথমে পরিকল্পনাটিকে আমরা সর্বপ্রকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করি এবং তারপর একটি সম্ভাবনাময় বিষয় সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেলি। নতুবা ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। দায়িত্বপূর্ণ পদে কোনও ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করার আগে আমরা তাঁর সততা এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার কার্যকরী সম্ভাবনা সম্বন্ধে চিন্তা করে নিই। আবার সম্ভাবনাই আমাদের পথ

দেখিয়ে মীমাংসার দিকে, চিত্ত সঙ্কল্পের দিকে নিয়ে যেতে পারে। একজনের সম্বন্ধে আর একজন কখনই নিশ্চিত ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারে না : সম্ভাবনার ওপর বারংবার আমাদের নির্ভর করে এগিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু প্রত্যেক নিয়মের আছে ব্যতিক্রম। যে নিয়ম আমরা এইমাত্র বর্ণনা করলাম, এরও ব্যতিক্রম আছে। এই মুহূর্তে আপনারা সেই ব্যতিক্রমের সম্মুখীন হচ্ছেন ভয়াবহরূপে। আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন–আমি বলছি না যে আপনারা মনে করেন–হয়তো মনে করতে পারেন, কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ওই জগদীশ সরকার দ্বারা তাঁর স্ত্রী কমলা সরকারকে খুন করার সকল সম্ভাবনা থাকা বিচিত্র নয়।

এই স্থানে হল ক্ষণের বিরতি। তারপর?

আপনারা যদি তাই মনে করেন, তবে কাঠগড়াস্থিত আসামিকে মুক্তি দেওয়া আপনাদের এখন অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য। একটি মাত্র রায় আপনারা প্রকাশ করতে পারেন এবং সে রায় হল–নির্দোষ।

এই মুহূর্ত পর্যন্ত সোমদেব চৌধুরী যেভাবে তার বক্তৃতা শুরু করেছিলেন, ঠিক একই প্রকার শীতল, কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন রক্ষা করে–থেমে থেমে, এবং প্রতিটি শব্দ ঠোঁটের আগায় আসার আগে শব্দটির গুরুত্ব মনে মনে বিবেচনা করে নিচ্ছিলেন। আচম্বিতে তাঁর কণ্ঠস্বর উদারা-মুদারা ছাড়িয়ে তারায় উঠে গেল, প্রতিটি শব্দ প্রত্যেকের

অন্তরে যেন গেঁথে যেতে লাগল–সমস্ত আদালত-কক্ষটি গম্ করে উঠল তার তীক্ষ্ণ এবং গম্ভীর কণ্ঠস্বরে। দ্রুতবেগে একটির পর একটি শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল তার মুখ থেকে?

মনে রাখবেন, এটা সম্ভাবনার আদালত নয়। এখানে সম্ভাবনার কোনও স্থান নেই, সে তর্কের কোনও অবকাশ এখানে নেই। এই স্থান নিশ্চিত সত্য নিয়ে আদান প্রদান করে–এই স্থানের নাম আদালত। যতক্ষণ না আপনারা নিশ্চিত হচ্ছেন যে আমার মক্কেল দোষী এবং দুয়ে দুয়ে যোগ করলে চার হয়–এই নিশ্চিত সত্যটুকুর মতো নিশ্চিত যে পর্যন্ত আপনারা না হতে পারছেন, ততক্ষণ আপনারা ওঁকে মুক্ত করে রাখবেন।

আবার, এবং তবুও আবার আমি বলছি–এটা আদালত, নিশ্চিত সত্যের স্থান। আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায়, আমরা প্রায় দেখি, সম্ভাবনাই আমাদের পথপ্রদর্শক। কখনও কখনও আমরা ভুল করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ভ্রম সংশোধন করতে পারি। ক্ষতিযুক্ত লগ্নীকরণকে সামলে নেওয়া যায় লাভযুক্ত লগ্নীকরণ দিয়ে; অসৎ ভৃত্য সরিয়ে সেস্থানে সৎ ভৃত্য আনা চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে –যেখানে হাতের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে রেখেছেন জীবন, অপর দিকে মৃত্যু–সেখানে ভ্রান্তির কোনও অবকাশ নেই, কেননা, এ ভ্রান্তি হবে অসংশোধনীয়। মৃত পুরুষকে জীবন দান করে আপনারা জীবিত করতে পারবেন না। এই লোকটি সম্ভবত হত্যাকারী, অতএব এ দোষী, এই কথা কখনই আপনাদের বলা চলে না। এ ধরনের রায় প্রকাশ করার আগে, এই লোকটি হত্যাকারী এই কথা বলার

মতো নিশ্চয়তা আপনাদের থাকা উচিত। আর ওকথা আপনারা বলতেই পারবেন না–কেন পারবেন না, তা আমি বলছি।

তারপর সোমদেব চৌধুরী একটির পর একটি প্রমাণ নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে প্রকাশ, ঊরুর হাড়ে যে বিকৃত-গঠন দেখা গেছে, তার ফলে নরকঙ্কালটির পক্ষে বিজ্ঞাপন–বর্ণিত ভাবে অবিকল ওই রকম খুঁড়িয়ে চলা উচিত–আর এই বিশেষ ভাবে খোঁড়ানোটাই হল কমলা সরকারের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাদীপক্ষ বিবিধ যুক্তিতর্কের সাহায্যে ডাক্তারদের স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে এ ধরনের বিকৃত গঠন অস্বাভাবিক হলেও অদ্বিতীয় নয়। শুধু বলা চলে এটা অসাধারণ। কিন্তু আবার খুব অসাধারণ নয়। শেষকালে, একজন ডাক্তার স্বীকার করলেন যে তাঁর তিরিশ বছর হসপিটাল এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিশকালে, ঊরুর বিকৃত-গঠন অস্থির কেস তিনি মাত্র পাঁচবার শুনেছেন। সোমদেব চৌধুরী ছোট্ট একটি স্বস্তির শ্বাস ফেললেন; তিনি যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন যে এরপর বিচারকের রায় কি হবে।

জুরির কাছে এই সব খুঁটিনাটি তথ্য তিনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। যতক্ষণ না অপরাধ সম্পর্কিত অন্যান্য বস্তু, দেহ অথবা দেহের সনাক্তকরণযোগ্য কোনও অংশ প্রমাণরূপে উপস্থাপিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া অনুচিত–এই যুক্তিটির ওপর বারংবার জোর দিতে লাগলেন। বিষ্ণুপুরের সেই কাহিনীটা তিনি বললেন, হত্যাপরাধে তিনটি লোকের ফাঁসি হয়ে যাবার দু-বছর পর কীভাবে নিহত ব্যক্তি শিশ দিতে দিতে গ্রামে ঢুকেছিল। ভদ্রমহোদয়গণ, তিনি বললেন, সবশেষে আমি

যা জানি, এবং আপনারাও যা জানেন, তা হল এই যে, যে কোনও মুহূর্তে কমলা সরকার প্রাকুটি করে এই আদালত-কক্ষ প্রবেশ করতে পারেন। (কয়েকটা শ্রোতা ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে বারকয়েক লক্ষ্য করল) আমি নির্ভীকভাবে শুধু এই কথাই বলব যে তিনি মৃত, এই ধরনের কোনও অনুমান করা আমাদের কোনওমতেই উচিত নয়।

জগদীশবাবুর আত্মপক্ষ সমর্থন অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত। যে কঙ্কালটি তিনি শ্রীকান্ত মিত্রের কাছে বিক্রয় করেছেন, সেটি গত তিন বছর যাবৎ বিভিন্ন অস্থি সংযোজন করে ধীরে-ধীরে তৈরি করেছিলেন। দুটি হাতে যে হুবহু মিল নেই, এদিকেও তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আর, বাস্তবিকই এই ছোট্ট বৈষম্যটুকুও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি।

সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার আগে জুরিবর্গ আধঘণ্টা ধরে নিজেরা আলোচনা করলেন। তারপর ঘোষিত হল, জগদীশ সরকার নির্দোষ।

কিছুদিন বাদে শুনেছিলাম জগদীশবাবু দিল্লিতে চলে গেছেন, সেখানেই তাঁর শিল্পনৈপুণ্য এবং নব বিবাহিতা নম্র স্বভাবা একটি বন্ধু নিয়ে সুখে আছেন। একজন পুরোনো বন্ধুর সাথে তার দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় সৌম্যমুর্তি জগদীশবাবু স্নিগ্ধ স্বরে বলেছিলেন, আমার বিচক্ষণ আইনজ্ঞটি আমায় একথাও বলেছিলেন যে, বেচারী কমলার মৃত্যু হয়েছে, একথা অনুমান করে নিলেও আমায় আর কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। প্রসন্নভাবে তিনি হেসে এরপর অন্য বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন।

সর্বশেষে একথা আমি বলে রাখতে চাই যে, আমার এ বর্ণনা হয়তো আংশিক কাহিনি হয়ে দাঁড়াতে পারে। সোমদেব চৌধুরীর অপূর্ব বাগ্মীতা স্মরণ করে যতটুকু আমি বলতে পারি, তা হল এই যে জগদীশবাবু নির্দোষ। খুব সম্ভব তাঁর কাহিনি সম্পূর্ণ সত্য। কমলা সরকারও বহাল তবিয়তেই জীবিত আছেন, বিষ্ণুপুরের মতো তিনিও হয়তো একদিন সাদা নিমফুল ভক্ষিত মুখ নিয়ে ফিরে আসতে পারেন। আমার এ কাহিনিতে যদি কিছু সংশয়ছায়া কারও ওপর আমি ফেলে থাকি, তখন তা হয়তো শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

যুক্তির পথে দেখলে কাঞ্চনপুর-রহস্য তাহলে মীমাংসিত রহস্য। নিশ্চয় তাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে?

কুরুক্ষেত্র। প্রতুল লাহিড়ী

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

কুরুক্ষেত্র। প্রতুল লাহিড়ী

স্থান–নির্জন কক্ষ । কাল–রাত্রি

(বিছানার ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম; মুখখানা চিন্তাচ্ছন্ন। কৃষ বসে অদুরে একখানা চেয়ারে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র।)

কৃষ্ণ : বেশ, তাহলে ধ্বংসই চলুক।

ভীষ্ম : পাঁচখানা তরবারির বিরুদ্ধে একশোটা তরবারি ঝলসে উঠবে...

কৃষ্ণ : এটা তরবারির যুদ্ধ হবে না, ঠাকুরদা।

ভীষ্ম? তবে কীসের যুদ্ধ হবে?

কৃষ্ণ : এটা বিজ্ঞানের যুগ...

ভীষ্ম : (অসহ্য বিস্ময়ে) বিজ্ঞানের যুগ আবার কী হে? চার যুগের নামই তো জানি, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এটা আবার কীসের ফ্যাকড়া?

কৃষ্ণ : (হাসলেন) বিজ্ঞানের যুগের সঙ্গে কারুর চালাকি খাটবে না। খাপের তরবারি খাপেই থাকবে, হাতের লাঠি থাকবে হাতে, তির-ধনুক পিঠেই ঝুলবে, মাঝ থেকে যোদ্ধার অকস্মাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটবে, অর্থাৎ হাত দুটো উড়ে যাবে দক্ষিণে, পা দুটো উড়ে যাবে উত্তরে, ধড়টার কোনও অস্তিত্বই থাকবে না।

ভীষ্ম : কিন্তু তা কী করে সম্ভব?

কৃষ্ণ : (দৃঢ়কণ্ঠে) বুদ্ধি, ঠাকুরদা, বুদ্ধি, স্রেফ কৃষ্ণের ক্ষুরধার বুদ্ধি...

ভীষ্ম : বুদ্ধিটা কি তোমার বৈজ্ঞানিক যুগেরই স্বধর্ম?

কৃষ্ণ ও আমার বুদ্ধি আমারই স্বধর্ম, বৈজ্ঞানিক যুগের নয়। যুদ্ধের নামে লোকধ্বংসের জন্য বৈজ্ঞানিকরা সৃষ্টি করবে এরোপ্লেন, মাস্টার্ড গ্যাস, বিমান বিধ্বংসী কামান, হাউইজার, শ্ল্যাপনেল, ইউবোট আর আমি...

.

নাটকটা অজয়ের লেখা।

ধনঞ্জয় মিত্রের প্রথম পক্ষের ছেলে অজয়। বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের বাতিক আছে। এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণীহত্যা করে জেল পর্যন্ত খেটেছে। দীর্ঘদিন স্বদেশ ছাড়া। বোম্বাইবাসী। রহস্যময় চরিত্র।

বৃদ্ধ ধনঞ্জয় মিত্র প্রথমে তার দেড় কোটি টাকার সম্পত্তি এই অজয়ের নামেই উইল করেছিলেন। তারপর অজয়ের কীর্তিকাহিনি যৎকিঞ্চিৎ শুনেই উইল পালটানোর মনস্থ করলেন। অমনি তাঁর এটর্নি মাধবচরণ মারা গেলেন বিষপ্রয়োগে। কিন্তু কেউ ধরতে পারল না, বিষটা কী ধরনের, শরীরেই বা ঢুকল কী করে। অজয় তখন বোম্বাইতে।

মুলতুবি রইল উইল পালটানো। দিন কয়েক পরে এটর্নি সারদাচরণকে ডেকে পাঠালেন বৃদ্ধ ধনঞ্জয় মিত্র। সারদাচরণ মাধবচরণের ছেলে। বাপ-বেটা দুজনেই এটর্নি।

দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলে বিজয় আর সুজয়কেও ডাকলেন ধনঞ্জয় মিত্র।

বিজয়কে ধমক দিয়ে বললেন ধনঞ্জয় মিত্র, তুমি যদি সেই অভিনেত্রীটিকে বিয়ে করার সঙ্কল্প ত্যাগ করো, তবেই সম্পত্তি পাবে। নইলে–

আপনার সম্পত্তি চাই না। বিজয় বললে সোজা গলায়।

ঠিক এমনি সময়ে একটা চিঠি এল ভৃত্যের হাতে। খাম ছিঁড়ে পড়লেন ধনঞ্জয় মিত্র। জবাব লিখে তক্ষুনি দিলেন ভৃত্যকে–ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়ার জন্যে।

বিজয়কে বললেন, গলাটা শুকিয়ে গেছে। সোডা আর গ্লাস দাও।

গেলাসে সোজা ঢেলে দিল বিজয়। তার কয়েক মিনিট পরেই অপমৃত্যু ঘটল ধনঞ্জয় মিত্রের। শরীরে দেখা দিল বিষক্রিয়া।

গ্রেপ্তার হল বিজয়।

কিছুদিন পরেই বোম্বাই থেকে ফিরে এল অজয়।

কোর্টে দাঁড়িয়ে সে বললে, বিজয় খুনি নয়। ওঁকে ছেড়ে দিন।

ছাড়া পেল বিজয়। কিন্তু অজয় সুনজরে দেখল না তাকে। বরং চেষ্টা করল তার প্রেয়সী অরূপা দেবীকে ফুসলে আনার। এই সেই অভিনেত্রী যার জন্যে সম্পত্তিও ত্যাগ করতে চেয়েছিল বিজয়।

টাকার লোভে মেয়েরা সব পারে। অরূপা দেবীকেও একদিন দেখা গেল অজয়ের বাড়িতে। অজয়ের নিমন্ত্রণ সে রেখেছে। অজয় নাটক লেখে। সেই নাটকের গান্ধারী রোলটা তাকেই করতে হবে। বাড়ির মধ্যেই একখানা ঘরে বসবাস শুরু করে দিল অরূপা দেবী। মনোমালিন্য হয়ে গেল বিজয়ের সঙ্গে।

অজয় কিন্তু কল্পনাও করতে পারল না, নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়ছে প্রতুল লাহিড়ী। সে-ই পাঠিয়েছে অরূপা দেবীকে, সরিয়েছে বিজয়কে মনে আঘাত দিয়ে।

এমন সময়ে একখানা চিঠি এল অজয়ের নামে। প্রতুল লাহিড়ী হস্তগত করল চিঠিখানা। লিখেছেন সারদাচরণ। শুধু দুটি শব্দ–পঞ্চাশ হাজারেও নয়।

পরদিন সকালে দেশসুদ্ধ লোক জেনে গেল আর একটা অপমৃত্যুর চাঞ্চল্যকর সংবাদ। সারদাচরণও মারা গেছেন রহস্যজনকভাবে বিষপ্রয়োগে।

পুলিশ দপ্তরে খবর এল। অজয় টেলিফোন করে জানিয়েছে সারদাচরণের মৃত্যুর আগে নাকি বিজয়কে সেখানেও দেখা গিয়েছে।

পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল বিজয়কে।

প্রতুল লাহিড়ী অরূপা দেবীকে পরামর্শ দিলে বিজয়কে নিয়ে গা-ঢাকা দিতে। কেঁদুটির এক কুঁড়ে ঘরে পালিয়ে গেল দুজনে। অজয়ের নাটকটা পড়বার জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে গেল অরূপা দেবী।

নাট্যকার হওয়ার শখ তখন মাথায় উঠেছে অজয়ের। জেল পালানো একটি মেয়ে এসে উঠেছে তার বাড়িতে। নাম তার উজালী। বোম্বাইতে বিয়ে করেছিল। মারাত্মক একটা বিষের সন্ধান এই উজালীর কাছেই সে জেনেছিল। বিষটা আসে একটা ফুল থেকে। ফুলটার নাম টামুই..

অরূপা দেবীকে অজয় বিয়ে করতে চায় জানতে পেরে বাঘিনী মূর্তি ধারণ করল উজালী। অজয়ের কুকীর্তি সে ফঁস করে দেবেই। মাধবচরণ, ধনঞ্জয় মিত্র এবং সারদাচরণকে দূর থেকেও খুন করার গুপ্ত রহস্য আর কেউ না জানলেও সে জানে...

কেঁদুটি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এল অরূপা দেবী। হাতে নাটকের পাণ্ডুলিপি। চোখ বড়-বড়।

প্রতুলবাবু, প্রতুলবাবু, খুনগুলো হচ্ছে কী করে ধরে ফেলেছিল। বিষ...বিষ...ফুলের বিষ।

জানি। বলল প্রতুল। টামুই ফুলের বিষ। কিন্তু প্রয়োগ হচ্ছে কী করে? চিঠির মধ্যে দিয়ে বললে বিশু। অজয়ের বাড়িতে ছদ্মবেশে হেঁসেল সামলেছে অ্যাদ্দিন। আড়ি পেতে

সাংঘাতিক চক্রান্তটা শুনেছে সে। এক্ষুনি কেঁদুটিতে লোক পাঠাতে হবে। বিজয়কে চিঠি লিখেছে অজয়। সে চিঠির জবাব দিলেই মারা পড়বে বিজয়।

কিন্তু কীভাবে?

উজালীকে বলল অজয়, চল আমরা পালাই বোম্বাইতে। খতম করে যাই বিজয়কে। পুলিশ তাকে খুঁজেছে খুনের অপরাধে। হঠাৎ মারা গেলে বুঝবে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে।

বলে, মারাত্মক চিঠিখানা লিখে ফেলে দিয়ে এল ডাক বাক্সে।

ফিরে এসে গুলি করল উজালীকে।

পুলিশ এসে দেখল বিষ খেয়েছে অজয়। টামুই ফুলের বিষ। মারা গেল বিশ মিনিট পরে।

অরূপা দেবীর হাত থেকে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা টেনে নিয়ে পড়ল প্রতুল লাহিড়ী।

.

কৃষ্ণ। আর আমি আর আমি ধ্বংস করব বিপুল কৌরব কুল–সামান্য একখানা চিঠির সাহায্যে।

ভীষ্ম–চিঠির সাহায্যে।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ। আমি লিখব যাকে সে জবাব দেবে–ব্যস। আয়োজনের কোনও ঘটা নেই আধ ঘণ্টার ভেতর মৃত্যু এসে ধীরে ধীরে গ্রাস করবে। কেউ জানবে না কেউ বুঝবে না ডাক্তারের বিশ্লেষণ শক্তি হবে পরাহত। বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরাজয়ের কালিমায় কালো হয়ে উঠবে।

ভীষ্ম। ব্যাপারটা বুঝিয়ে না বললে তোমার কথার একটা বর্ণও যে আমার মাথায় ঢুকছে, কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ! মাথায় ঢুকবে না, ঠাকুরদা। ফুলে কীট আছে শুনেছেন তো? এ সেই ফুল আর এ-সেই কীট..

লাফিয়ে উঠে বললেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর আনন্দমোহন, ব্যস ব্যস আর পড়তে হবে, বুঝেছি।

খাতা বন্ধ করে বলল প্রতুল লাহিড়ী, হ্যাঁ, শুধু একখানা ডাক টিকিট!

কী বুঝলেন?

.

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

চিঠি লিখে খামে মুড়ে ডাক টিকিট লাগানোর সময়ে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ জিভের ডগায় ডাকটিকিট বুলিয়ে নেন হাতের কাছে জল বা জলশোষক স্পঞ্জ থাকে না বলে।

অজয় ডাকটিকিটের পেছনে টামুই ফুলের বিষ মাখিয়ে রাখত। যাকে খুন করতে হবে তাকে চিঠি লিখে জবাব চাইত এবং ঝটিতি জবাব পাওয়ার আশায় নিজের ঠিকানা লেখা আর একটা খাম আর বিষ মাখানো ডাকটিকিট সঙ্গে দিত।

ধনঞ্জয় মিত্র উইল পালটাবেন শুনেই মাধবচরণকে সরিয়ে দিয়েছিল এইভাবেই হাতে খানিকটা সময় নেওয়ার মতলবে। তারপরে একই কায়দায় চিঠি লিখল ধনঞ্জয় মিত্রকে। উইল পালটাবার জন্যে তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং সবার সামনেই সেই চিঠির জবাব দিয়ে বিদায় নিলেন ধরাধাম থেকে।

মারা গেলেন সারদাচরণ একই পন্থায়। তিনি বোধহয় কিছুটা আঁচ করেছিলেন। অজয় তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল। ওটা অছিলা। উদ্দেশ্য জবাব নেওয়া। পঞ্চাশ হাজারেও নয় লিখে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লেন ভদ্রলোক।

এই হল কৃষ্ণের বৈজ্ঞানিক কুরুক্ষেত্র।

গন্ধর্বলোক

ঈশানীর চিঠি ঈশান কোণের মেঘের মতোই আমার ছুটির দফারফা করে ছাড়ল। নামডাক ।এমনিতে হয়নি। বোম্বাইয়ের রূপোলি পর্দার তারকা-রানি আমি। কাজেই আবেগ বস্তুটার মাত্রা আমার মধ্যে একটু বেশিই। স্নায়ুর ওপরেই আমাকে বাঁচতে হয়। জানি, সব চিত্রতারকাদের মতোই চল্লিশ ছুঁয়ে আমাকেও গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগতে হবে–স্নায়ুর ওপর অত্যাধিক চাপ দেওয়ার শাস্তি পেতে হবে। শিলাদকুমারও এই নিয়ে ঠাট্টা করে আমাকে।

বছরে পাঁচ-ছটা বড় বড় ছবিতে আমাকে নায়িকা হতেই হয়। দ্বিতীয় ছবির শুটিং শেষ হবার পর শিলাদকুমার ফিরল কাম্বোডিয়া থেকে। দুজনেই বেশ কাহিল। কেননা, সাতমাস একটানা কাম্বোডিয়ার ছবির কাজ করেছে শিলাদ। তাই প্রস্তাব করেছিল, আর একবার হানিমুনে বেরোনো যাক।

শিলাদের কথা শুনে হাসি পেয়েছিল বইকি। আর একবার হানিমুন, কথাটার কোনও মানে নেই আমার কাছে। কোনও হানিমুনই হয়নি আমাদের। বিয়ে হলে তো হবে। বিয়ে করার সময় পেলাম কখন? ফিল্মদুনিয়ার গন্ধর্বলোকে বিয়ে করার সময় কটা ভাগ্যবানের হয়?

সে যাই হোক, মধুচন্দ্রিমা যাপনের প্রস্তাব লুফে নিয়েছিলাম।

বাইরে বেরোনো নিরাপদ নয়। ভক্তদের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। তাই যেমন-তেমন ঘরে শুয়ে রইলাম। বাইরে বাজতে লাগল টেলিফোন। নীচে খটাখট শব্দে ব্যস্ত রইল অফিস টাইপরাইটার। ফ্যান-ক্লাব কর্মীরা ফুরসত পেল না চিঠির বস্তা থেকে মুখ তোলবার। ডিটেকটিভরাও রোজকারমতে টহল দিয়ে ফিরতে লাগল বাড়ি আর বাগানের প্রতিটি বর্গ ইঞ্চিতে।

আমি আর শিলাদ এয়ারকন্ডিশনড ঘরে শুয়ে বিভোর হয়ে রইলাম পরস্পরকে নিয়ে। এক-এক রাতে এক-এক ফুলশয্যার রোমান্সে মশগুল হয়ে রইলাম দুজনে দুজনকে নিয়ে। ব্রেকফাস্ট আসত সূর্য যখন মধ্যগগনে। আমি ক্রিম খেতে ভালোবাসি বলে শিলাদকুমার কত ঠাট্টাই না করত। বলত, দুদিনেই অ্যায়সা মোটা হবে যে ছবির কাজ আর জুটবে না। আমি শুনতাম না। ক্রিম আমার ভীষণ ভালো লাগে। এতদিনেও যখন মুটিয়ে যাইনি–তখন আর যাবোও না।

সেদিনও ব্রেকফাস্ট এলে ক্রিম খাচ্ছি। খেতে খেতে আমার চিঠির তাড়া থেকে একটা খাম বেছে নিলাম। খুলতেই দেখলাম ঈশানীর চিঠি।

শ্রীযুক্তা মদালসা দেবী
মান্যবরেষু,

আমি আর পারছি না। আপনার হয়ে জাল অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেছি। রেহাই পাবার জন্য চুল হেঁটে ফেলাম। তবুও মুক্তি নেই। আপনার ভক্তের দল এখনও রাস্তায় দেখলেই আমার পেছনে ছোটে। মনে করে আমিই মদালসা। বলে, কেন চুল ছাঁটলাম। অমন লম্বা চুল হেঁটে কেন ববছাঁট করলাম। মদালসা দেবী, আমি সত্যিই আর পারছি না। সারাটা জীবন নকল মদালসা দেবী হয়ে কাটাবার বিড়ম্বনা আর সইতে পারছি না।

বিনীতা
ঈশানী দত্ত

চিঠি পড়েই মাথা গরম হয়ে গেল। চিঠির বক্তব্যর জন্য নয়। এ চিঠি আমার কাছে এল কী করে? সেক্রেটারিদের পইপই করে বলে দিয়েছি, ভক্তবিটেলদের কোনওরকম স্তুতিপত্র যেন আমার সামনে না পৌঁছোয়। ফ্যান-ক্লাব খুলেছি কি এমনি-এমনি? খোশামুদে চিঠি প্রথম প্রথম ভালোই লাগত। ভাবতেও অবাক লাগে, এসব চিঠির জবাবও দিতাম। কিন্তু হাউইয়ের মতো খ্যাতির আকাশে উঠে পড়ার পর স্তুতিপত্র দেখলেই মেজাজ খিঁচড়ে যায়।

একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা। খ্যাতি যখন থাকে না, তখন খ্যাতির পেছনে দৌড়াই। খ্যাতি যখন আসে, তখন খ্যাতিকে এড়িয়ে চলি। শিলাদকুমার অবশ্য এর ব্যতিক্রম।

গোড়া থেকেই এ কারো ধার ধারেনি। গন্ধর্বলোকে হিরো রূপেই ওর প্রবেশ; প্রস্থানও ঘটবে হিরোর মতো।

তাই সেক্রেটারিদের ওপর ঢালাও হুকুম আছে, সব চিঠিই খুলে দেখবে। ব্যক্তিগত চিঠি আসবে, আমার সামনে-বাদবাকি সব যাবে ফ্যান-ক্লাবে। বাঁধা ছকের টাইপকরা চিঠিতে জবাব যাবে। এমনকী আমার সইকরা যে ফটোগ্রাফ পাঠানো হবে, তার সইটিও নিজে করব না–ওরাই আমার হয়ে করে দেবে।

মোট কথা, কোনও ধরনের ফ্যান-লেটার যেন আমার ত্রিসীমায় আসে। এই হল আমার অর্ডার। তা সত্ত্বেও ঈশানীর চিঠি আমার কাছে পৌঁছোয় কী করে?

বিরক্তি নিশ্চয় কণ্ঠেও প্রকাশ পেয়েছিল। কেননা, কাগজ পড়তে পড়তে মুখ তুলল শিলাদ–হল কী?

ফ্যান লেটার। হাজারবার বলেছি এসব চিঠি যেন আমার কাছে না পৌঁছোয়।

বলে, চিঠিটা ছুঁড়ে দিলাম ওর বিছানায়। এক হাতে তুলে নিল শিলাদ। ভারী সুন্দর হাতটা সিল্কের চাদরের পটভূমিকায় নতুন করে দেখলাম। হাত দেখে মানুষের চরিত্র ধরা যায়। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। তা না হলে যার চেহারা অমন অসুরের মতো, তার মন অমন মিষ্টি, অমন নরম, অমন শিল্পীসুলভ হবে কেন? ওর হাতে সে চিহ্ন আছে।

চিঠিটা পড়ল শিলাদ। পড়ে হেসে ফেলল–ঈশানী দত্ত! বেশ নাম। চিঠিটাও। ভক্তের চিঠি তো এরকম হয় না। ইন্টারেস্টিং! বলে, অপাঙ্গে তাকাল। চিঠিটার মধ্যে রহস্য আছে।

রহস্য! রহস্য আবার কি? এ চিঠি এখানে পৌঁছোল কী করে, এ ছাড়া আর কোনও রহস্য তো দেখছি না।

হাতের লেখাটা যে তোমার হাতের লেখার মতো। রহস্য সেইটাই।

কথাটা সত্যি। ঈশানী দত্তর হাতের লেখা অবিকল আমার হাতের লেখার মতোই।

সেকেন্ড কয়েকের মধ্যেই মতলবটা মাথায় এল আমার। খাট থেকে নামতে নামতে বললাম–চললাম।

কোথায়?

ঈশানীকে দেখতে।

কিন্তু এ যে হানিমুনের সময়! এই দ্যাখো কাগজেও তাই লিখেছে। এখন কি বাইরে বেরোয়?

নকল মদালসারও তো হানিমুনের ইচ্ছা যায়। বলে মুচকি হাসলাম আমি। বিধাতারও তখন হেসেছিলেন–অলক্ষ্যে।

বেশ তো, খাবার নেমতন্ন করো, বর্তে যাবে, শিলাদ বলেছিল।

উঁহু। থার্ডক্লাস যে-কোনও একটা হোটেলে শুধু দুজনে দেখা করব, কথা বলব। এই হল আমার আজকের অ্যাডভেঞ্চার।

সেই ব্যবস্থাই হল। প্যারাডাইজ হোটেল। বিকেল চারটে। ঘর বুক করার পর ঈশানী দত্তর প্যারেলের ঠিকানায় খবর পাঠালাম–আমি আসছি।

.

স্নান সেরে নখরঞ্জন করে চুল আঁচড়ে যখন আমার হেয়ার-ড্রেসারের চেম্বার থেকে বেরোলাম, তখন আমাকে নায়িকা-শ্রেষ্ঠা মদালসা বলে চেনা মুশকিল। প্রসাধন এবং কেশবিন্যাস আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই।

প্যারাডাইজ হোটেলের সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে হঠাৎ মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। নকল মদালসাকে দেখে লাভ কী? খামোকা এনার্জি নষ্ট..ধাপ থেকে পা নামিয়ে ফিরতে যাচ্ছি,

মনে পড়ল শিলাদকুমারের মুখ...ঠাট্টা...টিটকিরি...ভক্তের ভয়ে পলায়ন? নাঃ, ফেরা হল না। সোজা গেলাম অফিসরুমে। নাকের ডগায় চশমা এঁটে বুড়ো ম্যানেজার এমন ভাবে তাকাল আমার পানে যেন আমি মেয়েটা তেমন সুবিধের নয়। দুই চোখে বেশ সন্দেহ...বারান্দা দিয়ে এগোতে এগোতে বিড়বিড় করে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদানও করা হল। এ হোটেল নামী হোটেল, কুঅভিসন্ধি নিয়ে এখানে কেউ আসে না। হোটেলের দুর্নাম মালিক একদম সইতে পারে না। বলতে-বলতে বুক করা কামরার সামনে পৌঁছোলাম। দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলে ঢুকলাম। প্রায়ান্ধকার। একটা টেবিল। দূরপ্রান্তে গোটাতিনেক চেয়ার। কে যেন সেখানে বসে রয়েছে।

পেছন ফিরে দেখলাম বুড়ো নেই। বললাম–অন্ধকারে কি মুখ দেখা যায়? বলেই খট করে সুইচ টিপলাম। আলোয় ভরে উঠল ছোট্ট ঘরটা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম নকল মদালসার দিকে। চেয়ারে বসা মেয়েটি যেন আর একটা আমি।

তফাত শুধু পোশাক। আমি যা পরেছি, তা দামি না হলেও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু নকল আমি যা পরেছে, তা রীতিমতো নোংরা। যেমন ব্লাউজের ছিরি, তেমনি শাড়ির অবস্থা। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল। তা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তার মুখের আদলের হেরফের ঘটেনি। থুতনি সুডৌল। টানা টানা

চোখ। কামনার দুটি ডিপো। আমার ভক্তরা যে যে দেহশ্রীর জন্য আমাকে নিয়ে পাগল, সবই দেখলাম রয়েছে নকল আমির মধ্যে।

ঈশানী নির্ভয়ে তাকিয়েছিল। নিঃশঙ্ক চোখ। বলল–বসুন। কণ্ঠস্বর আমার মতোই। ঈষৎ ঘষা, ঈষৎ ধরা, ঈষৎ তীক্ষ্ণ। শুনেছি, পুরুষের রক্তস্রোত নাকি উদ্দাম হয় আমার এই কণ্ঠস্বরে। নকল আমি বহু চেষ্টায় এ স্বরও নকল করেছে।

আমি অভিনেত্রী। বিস্ময় চোখমুখ থেকে সরিয়ে রাখলাম। ঈশানী কিন্তু দেখলাম, মোটেই ঘাবড়ায়নি। মদালসার সামনে এসে বহু বাঘা রিপোর্টারও কেঁপে ওঠে। কিন্তু ঈশানী দত্ত বিন্দুমাত্র নার্ভাস হয়নি।

নৈঃশব্দ্য আমি ভাঙলাম। গৌরচন্দ্রিকার ধার দিয়েও গেলাম না। বললাম।–কি মনে করে?

কিছুই মনে করে নয়। বলল ঈশানী আমারই গলায়। আগে বসুন। অতদূরে নয়–আমার পাশে। ঈশানী যেন হুকুম করছে। যেহেতু তাকে আর আমাকে দেখতে যমজ বোনের মতো, অতএব আমার ওপর তার যেন একটা অধিকার জন্মে গিয়েছে। কত লম্বা আপনি?

প্রশ্নটা আকস্মিক। সুরটাও যেন কেমন-কেমন। কিন্তু গায়ে মাখলাম না। বললাম–সাড়ে পাঁচ।

আমারও তাই। ম্যাগাজিনেও তাই দেখেছিলাম। বাজিয়ে নিলাম।

কেন? বাজিয়ে নেবার দরকার কি? কিছু একটা বলা দরকার, তাই বললাম।

কোলের ওপর রাখা কালো হ্যান্ডব্যাগটা খুলল ঈশানী। একটা কালো রঙের সাইলেন্সার ফিট করা রিভলভার বার করে বলল–একটু পরেই আপনাকে খুন করব, তাই জেনে নিলাম। মরবার আগে কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।

নিস্তব্ধ ঘরে ঈশানীর কথা ফুরোলো। আবেগ নেই, উত্তাপ নেই, ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই। শুধু একটা ঘোষণা–আমাকে মরতে হবে। শুটিংয়ের সময়ে এরকম সংলাপ শুনলে মনে হত নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ঈশানীর কণ্ঠে নাটক নেই।

বিক্ষিপ্ত মনটাকে জড়ো করবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। শুধু মনে হল, অফিস ঘরের বুড়ো ম্যানেজার একটু আগেই হোটেলের সুনাম নিয়ে লম্বা-চওড়া বচন ঝেড়েছে; মনে পড়ল রাস্তার মোড়ে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার, এয়ারকন্ডিশনড ঘরে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে শিলাদকুমার। ইচ্ছে হল খামচে নিই রিভলভারটা। ফিল্ম হলে তাই করতাম। কিন্তু এটা বাস্তব। সব শেষ হতে চলেছে।

ধরা গলায় বললাম–কী করেছি আমি? কেন খুন করবে?

জবাব দিল না ঈশানী। রিভলভারটা দোলাতে দোলাতে শুধু চেয়ে রইল।

রাগ হয়ে গেল–ফঁদটা ভালোই।

ফাঁদ আপনার। আপনিই আমাকে ডেকেছেন।

কথাটা সত্যি। অ্যাডভেঞ্চারের লোভে নিজের ফঁদ নিজেই পেতেছি। চোখ ফেটে জল এল। কিন্তু কাঁদতে পারলাম না। শুধু বললাম ছেলেমানুষের মতো–কিন্তু কী অপরাধ করেছি আমি?

এ প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল ঈশানী। বল্লমের মতোই জবাবটা ছুঁড়ে দিল আমাকে লক্ষ্য করে–অপরাধ! শেষ নেই অপরাধের। প্রথম অপরাধ, হুবহু আমার চেহারা নিয়ে কেন এসেছিলেন পৃথিবীতে? দ্বিতীয় অপরাধ, এসেই ছিলেন যদি ফিল্মস্টার হতে গেলেন কেন? কেন আমার জীবন বিষিয়ে তুলেছেন? নিশ্চিন্ত মনে আমি কোথাও বেরোতে পারি না। বেরোলেই মদালসা মনে করে আমায় তাড়া করে, ছিঁড়ে খায়। কেন? কী অপরাধে? বছরের পর বছর কেন এই নির্যাতন? আপনার হয়ে মিথ্যে অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে যায়, জানোয়ার লোকগুলোর জ্বালায় অলিগলি দিয়ে মুখ ঢেকে পালিয়ে বেড়াই। কেন? কী অপরাধে? আজ সুযোগ এসেছে শোধ তুলবার, এই অত্যাচার বন্ধ

করবার। শুধু তাই নয়, এবার আমার পালা। বহু বছর মদালসার ছায়া হয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি, এবার হবো আসল মদালসা। হাঃ হাঃ, হাঃ।

পাগল? না। স্থির সংকল্পে বজ্রকঠিন মুখ। দীর্ঘ ক্লেশের শেষ হতে চলেছে। তাই আনন্দ জ্বলজ্বলে আনন। দুই চোখে কেবল ঘৃণা, অপরিসীম ঘৃণা।

ফিসফিস করে শুধু বললাম–আসল মদালসা হবে? আমাকে মেরে? পারবে না।

পারব না? কেন?

দেখতে আমার মতো হলেও সত্যি সত্যিই তো তুমি নও। আমার চালচলনই আলাদা। সে জিনিস রপ্ত করা মুখের কথা নয়। যেমন ধরো, এ হোটেল থেকে কতদুরে ঠিক কোনখানে গাড়ি পার্ক করেছি, তা তোমার জানা নেই।

বারান্দা থেকে তাও দেখেছি। মোড়ের কাছে বাস-স্টপেজের সামনেই গাড়ি পার্ক করেছেন।

ড্রাইভারের নাম? কী বলে ডাকবে?

কমলবাহাদুর। ডাকব শুধু কমল বলে।

যাবে কোথায়? কমলবাহাদুরকে বলবে কী?

ব্লু-টেম্পল, অবিকল আমার গলায় বলল ঈশানী।

কমল ধরে ফেলবে। এখান থেকে বেরিয়েই যে গাড়ি বাড়ি ফিরছি না, কমল তা জানে। আজ বিকেলে অনেক প্রোগ্রাম নিয়ে তবে রাস্তায় বেরিয়েছি।

বলব, কমল, আর পারি না। প্রোগ্রাম বাতিল। চলো ব্লু-টেম্পল। ছুটির সময়ে যতটা পারি জিরিয়ে নিই।

শুনতে-শুনতে বেশ বুঝলাম কমলবাহাদুরের ক্ষমতা নেই একথা শোনার পর নকল মনিবানিকে চেনে। গলার খোঁচগুলো পর্যন্ত নকল করেছে ঈশানী। বলবার কায়দায় কোনও ফারাক নেই। শুধু পোশাক পাল্টে নিলেই হল। আমার পোশাক ও পরবে–নিজের পোশক আমাকে পরাবে। কমলবাহাদুর কেন, স্বয়ং শিলাদকুমারও চিনতে পারে কিনা সন্দেহ।

উপায় নেই। কোনও উপায় নেই। আমার জীবনে গোপনতা নেই। আমি যে গন্ধর্বলোকের অপ্সরী। আমার চালচলন, খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা, হাবভাব–সবকিছুই পাবলিক প্রপার্টি। ভক্ত জনগণ মুখস্থ করে রেখেছে আমার অষ্টপ্রহরের পাঁচালী। ঈশানী আমাকে নিয়ে

লেখা প্রবন্ধ পড়েছে, আমার অভিনয় করা ফিল্ম দেখেছে, আমার সঙ্গে ফিল্ম সমালোচকের সাক্ষাৎকার মুখস্থ করেছে; ফলে আমার সব কিছুই তার নখদর্পণে। যে-কোনও মুহূর্তে আমার জায়গায় সে দাঁড়ানোর সব পর্বই তার কণ্ঠস্থ। কী ভয়ানক!

অভিশপ্ত গন্ধর্বলোকের পরী আমি। এই তো আমার জীবন। আমার কথা বলার রেকর্ডে আমার ভক্তবৃন্দ বারংবার শুনেছে। ঈশানীও শুনেছে। ভক্তিতে গদগদ হয়ে নয়–আমার সর্বনাশ কামনায়। রেকর্ডের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে রপ্ত করেছে মদালসার সেই বিখ্যাত কথা বলার ভঙ্গি।

ঠান্ডা গলায় বললাম–বিয়ে করেছ নিশ্চয়। স্বামী তো তোমায় ছাড়বে না।

স্বামী আমায় নেয় না।

আশ্চর্য মিল! আমার স্বামীও আমাকে নেয়নি।

ছেলেপুলে?

অবাক চাহনি মেলে তাকায় ঈশানী–সে কী! ভুলে গেলেন? আমাদের তো ছেলেপুলে নেই?

চমকে উঠেছিলাম কথা বলার ধরনে। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমাদের বলতে ঈশানী আর স্বামীর কথা বলা হচ্ছে। পরক্ষণেই বুঝলাম, তা নয় ঈশানী আর আমি আমাদের বলতে এই দুজনে। বছরের পর বছর এইভাবেই ভেবে এসেছে ঈশানী। মজ্জায় তার এই চিন্তাই পাকা আসন পেতে বসেছে। মদালসা মানেই ঈশানী–ঈশানী মানেই মদালসা। লোকে তার পিছু নিয়েছে মদালসা ভেবে-চিন্তাটা আরও কায়েমী হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে মদালসার অভিনয় করতে করতে ঈশানী নিজেও কখন মদালসা হয়ে গিয়েছে। সত্যিই তো আমি সন্তানহীনা। এখন প্রয়োজন কেবল পট পরিবর্তনের। আসল মদালসা নিহত হবে নকল মদালসার বেশে। আর, নকল মদালসা গিয়ে বসবে আসল মদালসার সিংহাসনে।

সফল হবে এক উন্মাদ ছন্নছাড়ার অপ্রকৃতিস্থ স্বপ্ন। তিল তিল করে খ্যাতির যে সৌধ আমি গড়ে তুলেছি, বহু বছরের সাধনায় যে বৈভব, যশ, প্রতিপত্তি অর্জন করেছি, কালো রিভলভারের একটিমাত্র গুলিতে তা চলে যাবে নোংরা পোশাকের ওই মেয়েমানুষটার দখলে। আর, খ্যাতিহীন হোটেলের প্রায়ন্ধকার ঘরে যথাসময় আবিষ্কৃত হবে নামগোত্রহীন একটি লাশ!

ঈশানী চেয়েছিল আমার পানে। চোখ তুলতেই বলল–একটা কথা জানার ছিল। শিলাদকুমার লোকটা কীরকম?

কনকনে বরফ-খণ্ডের মতো কথাটা কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত হানল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার স্রোত বইল অন্যদিকে। জানি শিলাদ কি বলবে। আমাকে নিকেশ করে ঈশানী আমার বেশে ব্লু-টেম্পলে ফিরলেই শিলাদ শুধোবে–কিগো পরী, ঈশানীকে দেখলে?

ঈশানী নতুন ঢং শুরু করবে। বলবে, চুলটা হঠাৎ ছাঁটতে হল। শুনে শিলাদ সাদাসাদা ঝকঝকে দাঁত বার করে অট্টহাসি হাসবে। কাছে টেনে নেবে ঈশানীকে।

লুঠ হয়ে যাবে শিলাদকুমার! আমার জীবনের সবচাইতে দামি, সবচাইতে আদরের, সবচাইতে গোপনীয় মণিকোঠায় ধুলো পায়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করবে শয়তানী ঈশানী। হীরে জহরতকেও ছড়িয়ে রাখি, কিন্তু সন্তর্পণে সরিয়ে রাখি যে মানুষটিকে–সেই শিলাদকুমারকে কেড়ে নিয়ে যাবে ঈশানী–কিন্তু কেউ কোনওদিন জানতেও পারবে না! শিলাদের নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত হবে ঈশানী, শিলাদের আদরে বিহ্বল হবে শয়তানি!

ভাবতে ভাবতেই লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখা যেন উদ্দাম নৃত্যে আগুন ধরিয়ে দিল শিরায় শিরায়, মগজের প্রতি স্নায়ুকোষে। যা হবার নয়, তাই হতে চলেছে–অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে। সেই মুহূর্তে দুর্বিসহ এই সম্ভাবনা নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেল আমার সমস্ত ভয়, আতঙ্ক, আশঙ্কা। ইচ্ছে হল...প্রচণ্ড ইচ্ছে হল চুলোয় যাক রিভলভারের তপ্ত বুলেট...ইচ্ছে হল লাফিয়ে গিয়ে ঝাঁপিড়ে পড়ি কুচক্রী ঈশানীর ওপর...আঁচড়ে কামড়ে চড়িয়ে পিটিয়ে কেড়ে নিই নিকষ হাতিয়ার...খামচে খুবলে ছিঁড়ে মেরে বিচুর্ণ করি ওর আকাশ-কুসুম আশার...কিন্তু না.মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে..শয়তানী বুদ্ধি দিয়েই কজায় আনতে হবে।

অকস্মাৎ পরিকল্পনাটার আবির্ভাব ঘটেছিল মগজে। মস্তিষ্কের সেই মুহূর্তের উর্বরতায় পরে বিস্মিত হয়েছিলাম। মিথ্যে...একটা ডাহা মিথ্যেকে বলতে হবে সত্যির মতো করে...পারব না? নিশ্চয় পারব..আমি যে অভিনেত্রী...মিথ্যের বেসাতিতে বড় কারবারী!

ঈশানী, আবেগের পুঞ্জ মেঘ গলার মধ্যে সঞ্চয় করে বললাম–ঈশানী, শিলাদকুমারের সব কথাই তোমাকে বলতে পারি। যা জানি–সব। তারপর তুমি আমাকে খুনও করতে পারো। কিন্তু আমার ভাগ্যে যা লেখা, তা রোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। ঈশানী, তোমারও নেই।

বলে থামলাম। সেকেন্ড কয়েক শব্দহীন সাসপেন্স সৃষ্টি করলাম। তারপর একই সুরে কথার খেই টেনে বললাম–ঈশানী, আমার পরিণতি রোধ করবার ক্ষমতা তোমারও নেই। নিয়তির লিখন, ঈশানী, নিয়তির লিখন। একথা কেউ জানে না, কাউকে বলিনি। কাগজে কোথাও বেরোয়নি। জানো আমার শেষ কোথায়? কী অবস্থায়?

উৎকণ্ঠা। নৈঃশব্দ্য। ঈশানীর নির্নিমেষ চাহনি।

আর মাত্র ছমাস। ছমাস পরেই আমাকে যেতে হবে অ্যাসাইলামে..রাঁচির পাগলাগারদে... দুরারোগ্য ব্যাধিতে দিনে দিনে পাকিয়ে যাচ্ছি আমি...এত খাই কিন্তু গায়ে মাংস লাগে না (ব্রেকফাস্টে ক্রিম খাওয়া নিয়ে শিলাদকুমারের রঙ্গ পরিহাস আমার মিথ্যেকে অনেকটা

সত্যির বনেদ জোগাল)... আর মাত্র ছমাস, ছমাস বাইরে থাকার অনুমতি দিয়েছে ডাক্তার...এই ছমাস শেষ বিশ্রাম নিচ্ছি। ব্লু-টেম্পলে..কাগজে কে না সে খবর পড়েছে...কিন্তু এ বিশ্রাম যে শেষ বিশ্রাম তা কেউ জানে না...জানে না শিলাদকুমার আমাকে শেষ সঙ্গসুখ দিচ্ছে বহু অর্থের বিনিময়ে...

এইখান থেকেই আমার অভিনয় প্রাণবন্ত হল। শিলাদকুমার যে দেহ মনে একটা অসুর ছাড়া কিছু নয়–এ সত্য বলতে বলতে আমি কেঁদে ফেললাম। শিলাদকুমার যে বহু অভিনেত্রীর শয্যায় অংশ নিয়েছে, এ ঈর্ষা আমার অন্তর সেই মুহূর্তে বিষিয়ে তুলল। শিলাদকুমারের সাত মাস কাম্বোডিয়া প্রবাস যে অনেক গোপন রঙ্গের মুখরোচক ইতিহাস, এ কল্পনা চোখের জল আরও বৃদ্ধি করল। ফলে, অশ্রু যেন বন্যার মতো উপচে পড়ল দু-গাল বেয়ে। রমণীমোহন শিলাদকুমার তুমি আমার যৌবন-সুধার শেষ বিন্দুটিও লুঠে নিতে এসেছ...তারপর যাবে নতুন ফুলে, নতুন মধুর লোভে। এ ফুল যাবে ঝরে...ছমাস পরে রাঁচির পাগলাগারদে শুরু হবে অনিশ্চিত জীবন। ডাক্তাররা? চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু শেষ ঘনিয়ে এসেছে...কেউ জানে না...জানি শুধু আমি আর শিলাদকুমার...

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার আমার ভাগ্যে একাধিকবার জুটেছে। কিন্তু সেদিনের অভিনয় বুঝি সব রেকর্ডকেও ম্লান করে দিয়েছিল। তিল তিল করে আমার দীপ নিভে যাওয়ার কাহিনির শেষে আমি অঝোর ধারে কাঁদতে লাগলাম।

ঘর নিস্তব্দ। আমার উচ্ছ্বাস এবার নীরব অশ্রুধারায় পর্যবসিত। দুহাতে মুখ ঢেকে বেশ কিছুক্ষণ ডুকরে কাঁদলাম। মনের চোখ দিয়ে দেখলাম, কালো রিভলভারের মিশমিশে নলটা আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে তাগ করেছে...অন্তিম নির্ঘোষের প্রত্যাশায় কাঠ হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

কিন্তু কোনও শব্দ নেই। নিস্তব্ধ ঘরে কেবল আমার ফোঁপানি যেন শ্মশানপুরীর হাহাকার সৃষ্টি করে চলেছে। দু-হাত নামিয়ে মাথা তুললাম। অবাক হয়ে গেলাম ঈশানীকে দেখে।

ঈশানী কাঁদছে। চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে কাঁদছে। রিভলভারের নলচে নির্মমভাবে চেপে ধরেছে চিবুকের নীচে।

আপনিও...আপনিও... ফুঁপিয়ে উঠল ও।

ঈশানী! আমার আর্ত চিৎকারে আমি নিজেই চমকে উঠেছিলাম। ঈশানী! না..না...! বলতে-বলতে ছিটকে গিয়েছিলাম চেয়ার ছেড়ে। এক, ঝটকায় ওর শিথিল মুঠি থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম রিভলভার। ঈশানী হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আমার ওপর। দু-হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে সেকি কান্না!

সেকেন্ডকয়েক গেল ওকে সামলাতে। অবশ্য রিভলভার হাতছাড়া করলাম না। সিধে হয়ে বসল ঈশানী। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে যা বলল, তা সত্যিই মর্মন্তুদ।

দৈব সহায় না হলে এরকম কাকতালীয় বড় একটা ঘটে না। কী করে যে এ কাণ্ড, ঘটল, তা এখনও ভাবলে আমার অবাক লাগে। আমার অজান্তেই ওর এমন একটা টন্টনে জায়গা ছুঁয়ে ফেলেছিলাম যে নিমেষে ভেঙে পড়েছিল ঈশানী। হয়তো ঈশানীর করাল ব্যক্তিত্বের প্রভাব সাময়িকভাবেও আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। অলৌকিক ঘটনাও ঘটে। নইলে ওর মনের গোপন ক্ষতে এভাবে আমার হাত গিয়ে পড়বে কেন?

অদ্ভুত কাকতালীয়। ঈশানী নিজেই এই একই ব্যাধিতে ভুগছে। যেদিন ও আমাকে চিঠি লিখে, তার আগের দিন ডাক্তার ওকে যে প্রেসক্রিপশন লিখেছে, তারও অর্থ ছমাস পরে পাগলাগারদে গিয়ে মগজ পরীক্ষা করা। এই ছমাস খোলা বাতাসে ঘুরেও যদি ঈশানীর দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম না ঘটে, তাহলে পথ ওই একটাই!

ঈশানী তাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। বছরের পর বছর নকল মদালসা থেকে একলাফে আসল মদালসা হবার প্ল্যানটা তখনি মগজে এসেছিল। এছাড়া বাঁচবার আর পথ নেই। প্রেসক্রিপশনের লিখনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর জন্যেই ও আমাকে মেরে আমার জীবনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! আমিও সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত? আমারও সেই শোচনীয় পরিণতি?

কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে উঠেছিল ঈশানীর। আমি আমার রুমাল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দিলাম। ও উঠে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় বলল–জানি না আর দেখা হবে কিনা।

পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। অভাবের যন্ত্রণা আর সইতে পারছিলাম না। কিন্তু নিয়তির চাইতে বড় আর কিছু নেই।

সেই মুহূর্তে আমার মনটা কীরকম হয়ে গেল। যে মেয়েমানুষটা কিছুক্ষণ আগেই কসাইয়ের মতো আমার হৃদ্যন্ত্র স্তব্ধ করার পণ করেছিল, সহসা তার অসহায় চাহনি নিঃসীম অনুকম্পায় ভরিয়ে তুলল আমার অন্তর। আমি আর একটি কথাও বললাম না। হ্যান্ডব্যাগ থেকে ফাউন্টেন পেন আর চেকবই বার করে দশ হাজার টাকার একটা বেয়ারার চেক লিখে দিলাম ঈশানীকে।

ও চেক নিয়ে আমার আগেই বিদায় নিল। সজল চোখে শেষবার আমার পানে তাকিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। নোংরা শাড়ি ব্লাউজের আড়ালে ছমাসের পরমায়ু নিয়ে প্রেতচ্ছায়ার মতো অদৃশ্য হল নকল মদালসা–আমার তারকা জীবনের দুষ্টগ্রহ!

.

শিলাদকুমার সব শুনে অট্টহাসিতে ঘর কাঁপয়ে তুলল।

–এরকম সুপারফাইন ব্ল্যাকমেলিং এর আগে কখনো ঘটেছে বলে শুনিনি। ওগো কন্যে, তোমার কপাল ভালো, ঈশানী এখনো ফিল্মে নামেনি। নামলে কী কাণ্ড ঘটত বলো তো? তুমি আর এ তুমি হতে না।

কথাটা একদম উড়িয়ে দিতে পারি না। কেননা ঈশানীর রিভলভারটা ব্লু-টেম্পলে এনেছিলাম। খুলেওছিলাম। কার্তুজের খুপরিতে একটা কার্তুজও পাইনি।

গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটনের মোতির মালা। হারকুল পয়রট

আগাথা ক্রিস্টি-র গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটনের মোতির মালা। হারকুল পয়রট।

হেস্টিংস বললে, পয়রট, চলো ব্রাইটনে গিয়ে মাথা ঠান্ডা করে আসি।

সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হল হারকুল পয়রট। এলাম ব্রাইটন। কিন্তু মস্তিষ্কের ব্যায়াম থেকে রেহাই পেলাম না। ঘটনাটা ঘটল সেই রাতেই।

পয়রট তো বলেই ফেলল, হেস্টিংস, ইচ্ছে যাচ্ছে কিছু হিরে-জহরত ছিনতাই করে নিই এই তালে। থামের পাশে ওই মোটা মেয়েটাকে দেখেছ? গয়নার সচল দোকান তাই না?

ওঁর নাম মিসেস ওপালসেন, বলল হেস্টিংস।

চেনো?

সামান্য। স্বামী শেয়ার মার্কেটের দালাল। তেলের হিড়িকে আঙুল ফুলে কলাগাছ।

খাওয়াদাওয়ার পর লাউঞ্জে দেখা হয়ে গেল ওপালসেন দম্পতির সঙ্গে। একগাল হেসে মিসেস তার বক্ষশোভা দেখালেন পয়রটকে। মানে, মূল্যবান কণ্ঠহারটি। তাতেও আশ মিটল না। হারকুল পয়রটকে তার মোতির মালা না দেখালেই নয়। ছুটলেন শোওয়ার ঘরে মহামূল্যবান নেই নেকলেস আনতে।

স্বামীদেবতা গম্ভীর চালে বললেন, মালার মতো মালা মশাই। দেখে চোখ ঠিকরে যাবে। দামটা অবশ্য চড়া–

কথা আটকে গেল এক ছোকরা খানসামার আবির্ভাবে। মেমসাহেব তলব করেছেন কর্তাকে।

দৌড়লেন ধনকুবের ওপালসেন। দশ মিনিট আর পাত্তা নেই।

ভুরু কুঁচকে বলল হেস্টিংস, আরে গেল যা! এঁরা কি আর আসবেন না?

পয়রট বললেন–না। একটা গোলমাল হয়েছে।

তুমি জানলে কী করে?

এইমাত্র হন্তদন্ত হয়ে অফিসঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন হোটেল ম্যানেজার। লিফটম্যান গুজগুজ করছে ওয়েটারদের সঙ্গে তিনবার ঘণ্টা বাজল লিফটের কিন্তু খেয়াল নেই লিফটম্যানের। ওয়েটারদেরও মন নেই খদ্দেরদের দিকে। ওয়েটাররা যখন খদ্দেরদের কথাও ভুলে যায়, তখন জানবে–দেখো, পুলিশ এসে গেল। সত্যি সত্যিই দুজন পুলিশ ঢুকল হোটেলে। তারপরেই দৌড়ে এল একজন হোটেল কর্মচারী।

স্যার, আপনারা দয়া করে মিস্টার ওপালসেনের ঘরে পায়ের ধুলো দেবেন?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। পয়রট যেন এক পায়ে খাড়া ছিল এতক্ষণ।

মিসেস ওপালসেনের ঘরে ঢুকে দেখলাম দেখবার মতো এক দৃশ্য। গয়নামোড়া গৃহিণী ইজিচেয়ারে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে কাঁদছেন হাপুসনয়নে। জলের ধারায় ধুয়ে যাচ্ছে মুখের পাউডার। পেছনে হাত দিয়ে রাঙামুখে পায়চারি করছেন কর্তা। পুলিশ-অফিসার নোটবই খুলে জেরা করছেন আর লিখছেন। একজন পরিচারিকা বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে সামনে। আর একজন রাগে ফুলছে পাশে দাঁড়িয়ে।

ব্যাপার অতি গুরুতর। মহামূল্যবান মোতির মালা চুরি হয়ে গেছে। খেতে যাওয়ার আগেও গিন্নি দেখেছিলেন মালাটা। গয়নার বাক্সে চাবি দিয়ে রেখে গেছিলেন টেবিলের ড্রয়ারে। গয়নার বাক্সের চাবিটা অবশ্য মামুলি। যে কেউ খুলতে পারে। ড্রয়ারেও চাবি থাকে না। কেননা, বলির পাঁঠার মত কাঁপছে, ওই যে মেয়েটা, ও সবসময় থাকে ঘরে।

ওর নাম সিলেসটিন। ফরাসি মেয়ে। গিন্নির সেবাদাসী। কর্তার হুকুমমতো সে ঘর থেকে বেরোয় না। এমনকি হোটেলের ঝি (রাগে ফুলছে যে মেয়েটা) যখন ঘরে ঢোকে, তখনও সিলেসটিন থাকে ঘরে। তা সত্ত্বেও এইটুকু সময়ের মধ্যে কে যে নিল মোতির মালা বোঝা যাচ্ছে না।

সিলেসটিন দৌড়ে এল পয়রটের সামনে। সে কী কান্না। পয়রট জাতে ফরাসি (পয়রট বলে, মোটেই না আমি বেলজিয়ান), সুতরাং সিলেসটিকে বাঁচাতেই হবে। গোলমুখো ওই ঝি মাগিই হাতসাফাই করেছে মালাটা।

হোটেলের ঝি তেড়ে উঠল। সার্চ করা হোক এখুনি। কিন্তু সার্চ করেও মোতির মালা পাওয়া গেল না কারও কাছে।

সিলেসটিন বললে, দু-বার আমি পাশের ঘরে গেছিলাম। ওইটাই আমার ঘর। একবার তুলো আনতে। আর কেবার কঁচি আনতে।

পয়রট ঘড়ি বের করে বললে, যাও তো একবার। দেখি কতক্ষণ লাগে।

দু-বার গেল সিলেসটিন। প্রথমবার লাগল বারো সেকেন্ড। দ্বিতীয়বার পনেরো সেকেন্ড।

পয়রট নিজে এবার ঘড়ি ধরে ড্রয়ার খুলল, গয়নার বাক্স বার করল। চাবি খুলল ডালা খুলে ফের বন্ধ করল, চাবি বন্ধ করল, ড্রয়ার খুলে রেখে দিল। সবশুদ্ধ লাগল ছেচল্লিশ সেকেন্ড। তার মানে, হোটেলের ঝি মোতির মালা নেয়নি। সিলেসটিনই চুরনী। সত্যি সত্যিই সিলেসটিনের বিছানার তলা থেকে পাওয়া গেল মালাটা।

পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তাকে।

পয়রট দেখল, টেবিলের পাশে একটা খিল আঁটা দরজা। ওদিক থেকেও আঁটা খিল। গেল সেই ঘরে। ফাঁকা ঘর। দরজার পাশেই একটা ধূলিধূসরিত টেবিল। ধুলোর ওপর একটা চৌকো ছাপ।

বেরিয়ে এল পয়রট। হোটেলের ঝিকে নিয়ে গেল মিস্টার ওপালসেনের ঘরে। গিন্নির ঘরের উলটোদিকে তার ঘর। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে বলল, এরকম একটা কার্ড দেখেছ কোথাও?

না তো। কার্ডটা উলটেপালটে দেখে বলল হোটেল-ঝি।

খানসামাকে ডাক। খানসামা আসতেই কার্ডটা বাড়িয়ে ধরল পয়রট। উলটেপালটে দেখে কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে ঘাড় নাড়ল খানসামানা, এ কার্ড সে আগে দেখেনি।

বেরিয়ে এল পয়রট। দুই চোখ বেশ উজ্জ্বল। বলল হেস্টিংসকে, আমি লন্ডন যাচ্ছি। হারকুল পয়রটকে এত সহজে ধোঁকা দেওয়া যায় না। মালা-চোর এবার ধরা পড়বে।

মালা তো পাওয়া গেছে, বলল হেস্টিংস।

দূর। ওটা নকল মালা। বলে গায়ের কোটটা হেস্টিংসের হাতে ধরিয়ে দিল পয়রট। বলল, কোটের হাতায় সাদা গুঁড়োটা বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে রেখো তো।

কীসের গুঁড়ো?

ফ্রেঞ্চ চক। ড্রয়ারে ছিল–কোটে লেগে গেছে।

পরের দিন সন্ধেবেলা ফিরে এল হারকুল পয়রট।

সত্যিই ফিরে এসেছে আসল মুক্তোর মালা। খাঁচায় ঢুকেছে হোটেল-ঝি আর খানসামা।

কিন্তু কীভাবে?

.

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

খানসামা বন্ধ ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল নকল চাবি হাতে। খিল খুলে রেখেছিল। সিলেসটিন প্রথমবার তুলে আনতে গেল নিজের ঘরে। ড্রয়ার টেনে গয়নার বাক্স বের করল হোটেল-ঝি। খিল খুলে চালান করল পাশের ঘরে। ফিরে এল সিলেসটিন। আবার গেল কাঁচি আনতে। আবার দরজা খুলল হোটেল-ঝি। খানসামা ততক্ষণে বাক্স খুলে মালা নিয়ে নিয়েছে। খালি বাক্সটা নিয়ে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল হোটেল-ঝি।

নকল মুক্তোর মালাটা সকালবেলা বিছানা ঝাড়বার সময়ে সিলেসটিনের গদির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল হোটেল-ঝি।

পয়রট দেখল খালি ঘরে ধুলো জমা টেবিলে একটা চৌকো ছাপ। গয়নার বাক্সটাও চৌকো এবং একই মাপের। বুঝে ফেলল হোটেল-ঝির সঙ্গে এ ঘরের খানসামা হাত মিলিয়েছে। তাই আগে থেকেই ফ্রেঞ্চ চক মাখিয়ে রাখা হয়েছিল ড্রয়ারে যাতে টানাটানিতে আওয়াজ না হয়।

সাদা কার্ডটা বিশেষ মশলা মাখানো আঙুলের ছাপ নেওয়ার কার্ড। ঝি আর খানসামার আঙুলের ছাপ কার্ডের ওপর ধরে নিয়ে পয়রট গেল লন্ডনে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুরোনো ফাইল দেখে বললো, এরা দুজনেই দাগি হিরে চোর। এখন ফেরারি।

গ্রেপ্তার হল দেবা আর দেবী। খানসামার পকেটে পাওয়া গেল আসল মুক্তোর মালা।

ফ্রেঞ্চ চক আর ধুলোর ছাপ হেস্টিংসও দেখেছিল কিন্তু বুদ্ধির খেলায় হেরে গেল পয়রটের কাছে।

ঘড়ি বিবি

বিয়ের আগে ওর নাম ছিল রাবেয়া। বিয়ের পর নাম দিলাম রেবা।

আমি যা ছিলাম, তাই রয়ে গেলাম। মিন্টু পাইন। সুবর্ণ বণিক।

সিকিখানা কলকাতার মালিক বলতে পারেন আমাকে। বাপ-ঠাকুরদার আমলে আরও প্রপার্টি ছিল। এখনো মোহর আছে, হিরে-জহরত আছে। থাকে ব্যাঙ্কের লকারে। টাকা ফিক্সড ডিপোজিটে। সুদ যা পাই, তা শুনলে চোখ কপালে উঠে যাবে আপনার। সেই সঙ্গে বাড়ি ভাড়ার অঙ্ক যদি শোনেন, হিংসে হবেই।

তাই থাকি সাদাসিধেভাবে। সোনার বেনেদের ওপর হিংসে অনেকেরই। সপ্তগ্রামী বেনে তো। কবে কোনওকালে ব্যবসা-বাণিজ্য করে আমার পূর্বপুরুষরা দেদার টাকা জমিয়েছিলেন, সুদে-আসলে তা বাড়তে-বাড়তে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, সারা জীবন লাটসাহেবি করে কাটালেও আমার পরের সাতপুরুষ বসে খেয়ে যেতে পারবে।

আমি কিন্তু কোনওরকম নষ্টামির মধ্যে যাইনি। বাবা এবং মা অকালেই স্বর্গধামে রওনা হওয়ার সময়েও আমি ব্যাচেলর। কিন্তু সাতগেঁইয়া স্টাইলে রক্ষিতা-ফক্ষিতাও রাখিনি।

আমার একমাত্র নেশা সন্ধে নাগাদ একটা ধনে পরিমাণ আফিং দুধ দিয়ে খাওয়া। আর কেবল দেশ দেখে বেড়ানো। পৃথিবীটাকে বারকয়েক পাক দিয়ে এসেছি।

ফ্র্যাঙ্কলি সব কথা বললাম। এরপর আমার এই আশ্চর্য কাহিনি বিশ্বাস করা না করা আপনার অভিরুচি।

মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী দেখে বেরিয়ে আসার সময় গাছতলায় একটি পরমাসুন্দরীকে একদিন বসে বসে কাঁদতে দেখে চমকে উঠেছিলাম। আমি সাতগেঁইয়া। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই ডাকসাইটে সুন্দরীদের দেখেছি ছোটবেলা থেকেই। রূপটুপ তাই কোনওকালেই আমাকে টলাতে পারে না। কিন্তু হাজারদুয়ারির বাইরে সেই অনিন্দ্যসুন্দরীকে দেখে আপনা থেকেই পা থেমে গেল আমার।

বয়স তার বড়জোর বিশ। কসমেটিকসের ভড়কি একদম নেই চোখে-মুখে। সবটাই ভগবানের দেওয়া। অমন কালো চোখ আমরা সাতগেঁইয়া মহলেও কখনো দেখিনি। অমন ঘন কালো কেঁকড়া চুল, দুধে আলতায় গোলা গায়ের রং আর নিখুঁত গড়ন-পেটন সারা পৃথিবী ঘুরে এসেও দেখিনি।

গাছতলায় একলা বসে এমন ভুবনমোহিনীকে কাঁদতে দেখে আমার মন চঞ্চল হয়েছিল। পাশে তার একটিমাত্র বোঁচকা। পরনে সাদা জমিনের লালপাড়ের সাদামাটা শাড়ি। শাড়ির খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছছে আর কেঁদেই চলেছে সে।

কাছে গেলাম। বৃত্তান্ত শুনলাম। আমিও পরম রূপবান। বিশ্বাস না হয়, এসে দেখে গেলেই পারেন। দুধ আফিংয়ের দৌলতে আর টাকা টনিকের কল্যাণে সাতগেঁইয়া চেহারা দেখলে মনে হবে নিশ্চয় ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কোনও নবাবপুর বুঝি। যদিও সাদাসিধেভাবে থাকি কিন্তু চেহারায় জুলুষ ঢাকা যায় না।

মেয়েটা চোখ মুছে আমাকে দেখেই প্রেমে পড়েছিল। তাই সব কথা খুলে বলেছিল। বাড়ি তার পুব-বাংলায়। বাপ-মাকে খেয়েছে অকালে। এক চাচা তাকে বর্ডার পার করে নিয়ে আসে। তারপর সোনার গয়না ভর্তি পুঁটলিটা সঙ্গে নিয়ে তাকে গাছতলায় বসিয়ে সরে পড়েছে। রেখে গেছে। কেবল এই বোঁচকাটা।

আমি মেয়েটাকে নিয়ে এলাম কলকাতায়। জ্ঞাতিগুষ্ঠিদের তোয়াক্কা করলাম না। একবার মসজিদে আর একবার পুরুত ডাকিয়ে–মুসলমানি মতে আর হিন্দুমতে তাকে বিয়ে করলাম। সেই থেকে রাবেয়া হল রেবা।

এইবার আসি আসল গল্পে। রেবার বোঁচকা দিয়েই এই বিচিত্র কাহিনির শুরু। বোঁচকার মধ্যে যেন সাত রাজার ধন আছে, এমনিভাবেই সবসময়ে তা আগলে রাখত রেবা। একদিন দেখলাম সেই সাত রাজার ধন।

বললে পেত্যয় হবে না আপনার। তবুও বলি। জিনিসটা একটা ঘড়ি। সেকেলে পেন্ডুলাম ঘড়ি। কিন্তু বাইরের গড়নটা মামুলি ঘড়ির মতো নয়। একটা মেয়েছেলের মুর্তি। ঘোমটা ফাঁক করে যেন সে উঁকি দিচ্ছে বাইরে। কিন্তু মুখের বদলে একটা ঘড়ি।

আমি এমন আজব ঘড়ি মশাই জীবনে দেখিনি। সাতগেঁইয়াদের সাতমহলা বাড়িতে হাজার রকমের দিশিবিলিতি ঘড়ি দেখেছি এতটুকু বয়স থেকে। কিন্তু মেয়েমানুষের চেহারাওয়ালা এমন অদ্ভুত ঘড়ি লাইফে দেখিনি। মেয়েটার মুখ নেই–অথচ তাকে বেশ সুন্দরীই মনে হয়। মনে হয় ঘোমটা সরিয়ে মুখটা দেখি। তার হাঁটু বেঁকিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমার মধ্যেও এমন একটা আকর্ষণ যে একবার তাকালে আবার তাকাতে ইচ্ছে যায়–একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে যায়।

আমিও চেয়েছিলাম। ঘাড়ের ওপর ফোঁস করে নিঃশ্বেস পড়তেই বুঝলাম রেবা এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় না ফিরিয়েই বললাম–চমৎকার ঘড়ি তো!

রেবা জবাব দিল না। আমারও চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হচ্ছিল না ঘড়ি-সুন্দরীর ওপর থেকে।

ঘাড় না ফিরিয়েই বললাম–এমন ঘড়িকে বোঁচকায় রেখেছ কেন? ঝুলিয়ে দাও দেওয়ালে। দু-চোখ ভরে রোজ দেখি।

রেবা তখনও জবাব দিল না।

আমিও একদৃষ্টে ঘড়ি-সুন্দরীকে দেখতে দেখতে বললাম–সত্যিই সুন্দরী। তোমার মতোই।

তাই বুঝি? খুব আস্তে কানের কাছে কথাটা বলল রেবা। গলার স্বর আর বলার ভঙ্গিটা এমন যে শুনেই খটনা লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। রেবা অনিমেষে তাকিয়ে আছে সেই ঘড়ির দিকে।

কার ঘড়ি, রেবা?

রেবা জবাব দিল না। কোনওদিনই দেয়নি। জিগ্যেস করে করে মুখ ব্যথা হয়ে যাওয়ায় আমিও আর জিগ্যেস করিনি। শুধু বুঝেছি, ঘড়িটা তার প্রাণ। এবং ঘড়ি নিয়ে কাউকে কোনও কথা বলতেই সে রাজি নয়।

ঘড়িটা কিন্তু জোর করেই আমি আমার শোওয়ার ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। দিন-কতক ঠিকমতো চলেছিল, সময়ও দিয়েছিল। তারপর একদিন রাত্রে দেখলাম ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে।

মাঝ রাতে উঠেছিলাম পেট ব্যথা করছিল বলে। আফিং খেলে পেটে বড় বায়ু হয়। পেট ফাঁফে। আমারও ঘুম ভেঙে গেছে। এমনিতে বায়ুর রোগ। তার ওপর আফিং। রেবা ঘুমোচ্ছে দেখে আমি নেমে এলাম খাট থেকে। চোখ পড়ল ঘড়ির ওপর।

.

দেখলাম, পেন্ডুলাম দুলছে না। তার মানে ঘড়ি থেমে আছে। দম দেওয়া হয়নি বোধহয়। ও ঘড়িতে দম দেওয়ার ভার অবশ্য আমার নয়–রেবার। দম দেওয়া, তেল দেওয়া–সব ওর কাজ। তাই ঘড়ি বন্ধ দেখে আমি আর ঘড়িতে হাত না দিয়ে খাটের পাশ দিয়ে বাথরুমের দিকে এগোচ্ছি, এমন সময়ে টিক-টক টিক-টক আওয়াজ কানে ভেসে এল।

ঘড়ি তো বন্ধ। অথচ স্পষ্ট পেন্ডুলাম দোলার আওয়াজ হচ্ছে। ফিরে দেখলাম পেন্ডুলাম দুলছে না। ঘড়ি বন্ধ। টিক-টক টিক-টক আওয়াজটা বেশ শোনা যাচ্ছে। ঘর নিস্তব্ধ বলেই স্পষ্ট কানে বাজছে।

ধুত্তোর। আফিংয়ের মৌতাত তো। বাথরুম থেকে ঘুরে শুয়ে পড়লাম। টিক-টক আওয়াজ শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে চা খেতে খেতে রেবাকে ঘটনাটা বলতেই ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। এক হাঁটু বেঁকিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাটা

অনেকটা ওই ঘড়ি-সুন্দরীর মতোই। ঘাড় বেঁকিয়ে মুখের দিকে তাই চেয়েছিলাম। ঘড়ির বদলে অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা দেখলাম। যেন সমস্ত রক্ত নেমে গেছে সেই মুখ থেকে।

কী হল?

ত্রস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রেবা। এ সম্পর্কে আর কোনও কথাও হল না পরে।

এরপরেও একদিন রাত্রে দেখলাম, আর শুনলাম সেই একই কাণ্ড। ঘড়ি তো বন্ধ কিন্তু টিক-টক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে রেবা।

সকালবেলা কথাটা বললাম রেবাকে। আবার সেইভাবে মুখখানা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে করে ঘর থেকে ছুটে পালাল রেবা।

তারপর থেকেই দেখতাম, রাত্রে আর রেবা ঘুমোয় না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে দেওয়ালের ঘড়ির দিকে। ভোর হলেই ঘুমিয়ে পড়ে অকাতরে। যতক্ষণ জেগে থাকে, ঘড়িও চলে বেশ টিক-টক করে।

জোর করে ওকে নিয়ে এলাম পুরীতে। ঘড়িটা আনতে চেয়েছিল সঙ্গে। আমি রাজি হইনি। আমার মন বলছে, ওই ঘড়িই যত নষ্টের গোড়া। ওকে দূরে রাখা দরকার।

পুরীতে রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল ঢেউয়ের গর্জনে। শুধু ঢেউয়ের গর্জনে নয়–আরও একটা আওয়াজে। টিক-টক শব্দটা যেন কানের কাছেই বাজছে।

উঠে বসলাম। ঘরে কোথাও ঘড়ি নেই। আমার হাতে ইলেকট্রনিক রিস্টওয়াচ। শব্দের বালাই নেই।

টর্চ জ্বেলে দেখছিলাম আশপাশ। হঠাৎ টর্চের আলো রেবার চুলের ওপর পড়তেই চমকে উঠলাম। ওর মাথা ভর্তি ঘন কালো চুলের মধ্যে সেই প্রথম সাদার ঝিলিক চোখে পড়ল। এর আগে ওর মাথায় পাকা চুল কখনো দেখিনি। এই বয়েসে চুল পাকার কথা ভাবাও যায় না। উদ্বেগে অবশ্য পাকে। ঠিক করলাম, কলকাতায় ফিরেই ডাক্তার দেখাতে হবে।

সকাল হল। আমার আগে অনেক ভোরে উঠে পড়েছিল রেবা। মুখ-চোখ বড্ড ক্লান্ত দেখলাম। যেন রাতারাতি বুড়িয়ে গেছে। মাথার পাকা চুলের সংখ্যা আরও বেড়েছে।

ক্লান্ত চোখে ক্লান্ত কণ্ঠে ও বললে–বাড়ি চলো এখুনি।

সে স্বর, সে চাউনি উপেক্ষা করতে পারলাম না। ফিরে এলাম কলকাতায়। বাড়িতে ঢোকার মুখেই দেখলাম দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, চোর পড়েছিল, যা পেয়েছে, নিয়ে গেছে। শোবার ঘরে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে গেছে ঘড়ি সুন্দরীকে।

ধপ করে একটা শব্দ হল পেছনে। রেবা দু-হাতে বুক খামচে ধরে বসে পড়েছে মেঝেতে। মুখ নিরক্ত।

টেলিফোন তুললাম ডাক্তারকে ফোন করব বলে। লাইন খারাপ। বেরোতে যাচ্ছি–বাধা দিল রেবা। কোনও কথা না শুনে ছুটে গিয়ে ডেকে আনলাম ডাক্তার।

শোবার ঘরে ঢুকে কিন্তু রেবাকে দেখলাম না–ঘড়ি সুন্দরীকেও দেখলাম না। এক বস্ত্রে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে রেবা–সঙ্গে নিয়ে গেছে ওর প্রাণ সেই ঘড়িটাকে।

রেবাকে আজ পর্যন্ত আর দেখিনি। আপনার চোখে পড়লে কাইন্ডলি খবর দেবেন। আমার মন বলছে ওকে কাছে পেলে সেই অদ্ভুত রহস্যের ব্যাখ্যা ঠিক পেয়ে যাব। নিস্তব্ধ রাতে ঘড়ি বন্ধ থাকলেও ঘড়ি চলার আওয়াজ কোত্থেকে হয়। ঠিক জানতে পারব–কানটা শুধু পাততে হবে–ওর বুকে!

ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্রনাথ

গোয়েন্দা আমরা প্রত্যেকেই, দাঁতে কামড়ানো চুরুটের ফাঁক দিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে বলল ইন্দ্রনাথ। প্রাত্যহিক জীবনে কে গোয়েন্দা নয় বলতে পারো?

চাইনিজ শ্রিম্প বল খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল কবিতা। সাদা বাংলায়, চিংড়ি, পকৌড়া। পাকস্থলী পরিপূর্ণ হওয়ার পর শুরু হয়েছে নির্ভেজাল আচ্ছা।

মেয়ে-গোয়েন্দা অবশ্য ঘরে ঘরে, সোয়ামীদের ওপর নজর রাখার সময়ে, মুচকি হেসে চুটকি ছাড়ল কবিতা : যেমন আমার ঘরে আমি গোয়েন্দা।

ইন্দ্রনাথ রসিকতার মুডে ছিল না। তাই একতাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে, যেমন ধরো উকিল, ডাক্তার, অফিসার, ব্যবসাদার, রিপোর্টার। হোয়াইট হাউসের ভিত কাঁপিয়ে ছাড়ল দুজন রিপোর্টার। গিয়েছিল চুরির ঘটনার খোঁজে–পেলো সাপের সন্ধান। শুরু হল গোয়েন্দাগিরি। টেলিফোনে খবর নিতে হবে? প্রশ্ন করে চুপ করে থাকো দশ সেকেন্ড। জবাব না এলে বুঝতে হবে প্রশ্নের জবাব হল হ্যাঁ। টেলিফোনও যখন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল, তখন হোয়াইট হাউসের কেউকেটাটির সঙ্গে দেখা করার সঙ্কেত জানানো হত ঝুল বারান্দার কোণে ফুলদানি বসিয়ে দেখাসাক্ষাতের সময় জানানো হত পরের দিনের নিউইয়র্ক টাইমস-এর ২০ নম্বর পৃষ্ঠায়। সেই পৃষ্ঠায় ঘড়ির কাঁটা এঁকে গোপন

সংবাদদাতা জানিয়ে দিতেন কোথায় কখন দেখা পাওয়া যাবে তার। আশ্চর্য, তাই না? গোয়েন্দা সাংবাদিকদের দৌলতেই সিংহাসনচ্যুত হলেন বহু কু-কর্মের নায়ক প্রেসিডেন্ট নিকসন।

আমি বললাম, নতুন কথা কিছু শুনছি না।

ভুরু তুলে ইন্দ্রনাথ বললে, নিকসনের ছিদ্র অন্বেষণ দূর করে শুধু একখানা বই লিখেই বব আর কার্ল আজ পর্যন্ত পিটেছেন এক কোটি চোদ্দো লক্ষ টাকা। বই লেখার আগেই প্রকাশকের কাছে পেয়েছেন পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার। প্লেরা পত্রিকা লেখাটা ছেপেছে ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে। ফিল্ম প্রোডিউসার সিনেমা করবেন বলে দিয়েছেন সাড়ে চার লক্ষ ডলার। পেপার ব্যাক বার করার জন্যে নিলাম করে বইটার দাম তুলে দিয়েছেন দশ লক্ষ ডলার পর্যন্ত। পুলিজার পুরস্কার পর্যন্ত পকেটে পুরেছেন ওঁরা। মৃগাঙ্ক, ইচ্ছে যায় আমার কেসগুলো বব আর কার্লের হাতে তুলে দিই। কলমের জোর থাকলে কি না হয়!

মাথা গরম হয়ে গেল আমার : নিজেকে বিরাট মনে করছিস মনে হচ্ছে? আমার না হয় কলমের জোর নেই, তোরও গোয়েন্দাগিরির জোর এমন কিছু নেই যে রাতারাতি পৃথিবী বিখ্যাত হবি। এত অহঙ্কার ভালো নয়। পতনের পূর্ব লক্ষণ।

যেন শুনতেই পায়নি। এমন ভাবে জানলা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথ আত্মগত ভাবে বলে চলল, যত ভাবি ততই অবাক হই। গোয়েন্দা কে নয়? সব মানুষই নিজের নিজের পেশায় অল্পবিস্তর গোয়েন্দা। চিন্তাকে যে ডিসিপ্লিনে আনতে পেরেছে, বুদ্ধিকে যে একাগ্র করতে পেরেছে, পর্যবেক্ষণকে যে প্রয়োগ করতে পেরেছে–গোয়েন্দা হবার যোগ্যতা তার মধ্যে আছে। ভালো ডাক্তারকেও ফাঁদ পেতে রোগকে সন্ধান করতে হয়। এইরকম একটি চরিত্র শার্লক হোমস এবং সুবিখ্যাত ডিটেকটিভ মেথডের সৃষ্টি করেন কোনান ডয়াল। অফিসার যদি অন্ধ হয়, কারবারি যদি ভোঁতা-বুদ্ধি হয়, তাহলে লুঠেরা জোচ্চোরেরা দুদিনেই রাজা হয়ে বসত। বুদ্ধির লড়াই চলছে। সর্বক্ষেত্রে। এরকম টুকটাক অনেক ঘটনা আমার জানা আছে। অফিসার নিজেই গোয়েন্দা হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে কোম্পানির।

তা ঠিক, সায় দিল কবিতা : প্রবঞ্চকরা দুষ্ট জীবাণুর মতোই কিলবিল করছে আশেপাশে। যে যত ভালো গোয়েন্দা, সে তত নিরাপদ। কথাগুলো দামি কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার নিরীহ সোয়ামীকে ঠেস দিয়ে কথা বলার কি দরকার বলতে পারো?

কেন বলব না বলতে পারো? চুরুট নামিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, স্ট্যানলি গার্ডনার, সিরিল হেয়ার–এঁরা প্রত্যেকেই পেশায় উকিল। তাই তাদের গোয়েন্দা গল্পে অত ধার। কোনান ডয়াল, নীহার গুপ্ত পেশায় ডাক্তার–তাই লেখাও ক্ষুরধার। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জি-কে চেস্টারটন সাহিত্যের সম্রাট–গোয়েন্দা গল্পেও তার আভাস। কিন্তু আমাদের মৃগাঙ্ক রায়ের

কি গুণ আছে বলতে পারো। না, না, চটলে চলবে না। গুণীর কাছে প্রশস্তির চেয়ে সমালোচনার কদর বেশি।

কিন্তু এর নাম ছিদ্রান্বেষণ–সমালোচনা নয়। মুখ টিপে হেসে বলল কবিতা।

ছিদ্র অন্বেষণ করাই তো আমার কাজ। চুরুট ফের কামড়ে ধরে বলল ইন্দ্রনাথ, নিচ্ছিদ্র চক্রান্তে ছিদ্র খুঁজে বার করার সাধু নাম হল গোয়েন্দাগিরি। সত্য আর ছিদ্র এক্ষেত্রে একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ।

মুখ লাল করে বললাম, এর শোধ আমি তুলব, ইন্দ্র। এখন থেকে তোকে ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্রনাথ বলেই চালাব–সত্যান্বেষী নয়।

অট্টহেসে বললে ইন্দ্রনাথ, ভালোই তো, তাতে এক ঢিলে দু-পাখি মরবে। তোর ভাষায় গ্ল্যামারের অভাব প্রকাশ পাবে। আর, এতদিন বাদে আমার কপালে একটা খেতাব অন্তত জুটবে।

এমন সময়ে কবিতা বললে সবিস্ময়ে, ওকি অবনীবাবু, নাক টিপে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

রাগ জল হয়ে গেল দরজার দিকে তাকাতেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অবনী চাটুয্যে দাঁড়িয়ে সেখানে। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে আছেন বাঁ-নাকের বাম ছিদ্র। বললেন অনুনাসিক কণ্ঠে, দেখছি উঁন ফুটোয় নিসে পড়ছে কিনা।

তাজ্জব হয়ে বললাম, সে আবার কী?

নাক ছেড়ে দিয়ে বাঁ-পা আগে বাড়িয়ে ঘরে পদার্পণ করলেন অবনীবাবু। বললেন, শাস্ত্র তো মানেন না। মানলে এত দুর্ঘটনা দেশে ঘটত না।

সকৌতুকে বলল ইন্দ্রনাথ, ইড়া আর পিঙ্গলার ব্যাপার মনে হচ্ছে?

ভীষণ খুশি হলেন অবনীবাবু ও যাক, জানেন তাহলে। শুভকর্মে চন্দ্রনাড়ী প্রশস্ত। মানে, বাঁ-নাকে নিসে পড়লেই শুভকর্ম করা উচিত।

এখন কোন নাকে পড়ছে দেখলেন?

বাঁ-নাকে। সেই জন্যেই তো বাঁ-পা ফেলে ঢুকলাম মশায়।

অশুভ ঝাটে পড়েছেন মনে হচ্ছে?

টাক চুলকে বললেন অবনীবাবু, আর বলেন কেন, একেবারে নিচ্ছিদ্র প্লট মশাই– স্কাউড্রেলটাকে ধরেও ধরতে পারছি না।

অপাঙ্গে আমার পানে চাইল ইন্দ্রনাথ। বলল, ছিদ্র খুঁজতে হবে তো? বলুন, বলুন, ছিদ্রান্বেষী হাজির।

.

বলব কি মশায়, রাত দুটোর সময়ে সে কি উৎপাত! ঝনঝনঝন। বুঝছেন তো কীসের উৎপাত? টেলিফোন! টেলিফোন! যতক্ষণ মরে থাকে, ততক্ষণ ঘুমিয়ে খেয়ে জিরিয়ে বাঁচি মশায়, জ্যান্ত হলেই প্রাণান্ত!

যাক, যা বলছিলাম, রাত দুটোর সময়ে আরম্ভ হল টেলিফোনের বাঁদরামি। ঠিক যেন ঘুংড়ি কাসি। ইচ্ছে হল দিই ব্যাটাকে এক ডোজ স্পঞ্জি খাইয়ে। হোমিওপ্যাথি বিদেশ থেকে এসেছে বলে এত হেনস্থা করবেন না। গরু হারালে শুধু গরু খুঁজে পাওয়া যায় না। বাদবাকি সব হয়। মহাত্মা হানিম্যান বলেছেন...

যাচ্চলে! যা বলতে যাচ্ছিলাম ভুলে গেলাম...। ও হ্যাঁ, নিচ্ছিদ্র প্লট। রাত দুটো। টেলিফোন। ঘুম ভাঙতেই তেড়েমেড়ে রিসিভার খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কে? কে? এত রাত্রে কীসের দরকার?

অমনি মিষ্টি গলায় তোতলা স্বরে ককিয়ে উঠছিল একটা মেয়েছেলে : অবনীবাবু? বাঁ-বাঁচান! ওরা আ-আ-আমাকে কিডন্যাপ করতে আসছে!

সে এক জ্বালা মশায়! ভগবান তোতলাদের মেরেছেন। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু কথা বলতে গেলে বলুন দিকি মাথা গরম হয় না?

যাই হোক, হড়বড় করে তোতলাতে তোতলাতে মেয়েটা বললে পার্ক টেরেসের দশতলার ফ্ল্যাট থেকে তাকে গায়েব করতে আসছে ডাকাতরা। এক্ষুনি না এলেই নয়।

কথার শেষ পর্যন্ত শোনা গেল না, কড়-ড়-ড় করে গেল লাইনটা কেটে। এদিকে অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে মরছি; অথচ টেলিফোনটা পর্যন্ত নিখুঁত বানাতে পারি না। মাইক্রোস্কোপ আনাই বিলেত থেকে। ঘেন্না ধরে গেল মশাই দেখে শুনে।

ওইরকম টেলিফোন পেলে চুপচাপ থাকা যায় না। দূরভাষিণীর মুণ্ডপাত করতে করতে ধড়াচূড়া এঁটে নিলাম। পার্ক স্ট্রিটেই যখন বদলি হয়েছি, তখন পার্ক টেরেসে না গিয়েও তো থাকা যায় না। বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আবার উৎপাত। ফের টেলিফোন!

এবার অবিকল সেই রকম মেয়েলি গলা। সেই রকমই মিষ্টি, কিন্তু যেন সর্দির্বসা–মানে আপনাদের ছেলেছোকরাদের ভাষায় সেক্সি। শুধু যা তোতলা নয়।

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। প্রথম মেয়েটার নাম হিমি, দু-নম্বর মেয়েটার নাম হিমা। হিমি নাকি হিমার ছোটবোন। হিমা কান্না কান্না গলায় বললে, এক্ষুনি নাকি হিমিকে জোর করে নিয়ে যাবে মেয়েচোরেরা। ঠিকানাও বলে দিল। একই ঠিকানা। পার্ক টেরেসের দশতলা।

দুজন সেপাই আর একজন অফিসারকে নিয়ে ছুটলাম তক্ষুনি। নির্জন রাস্তা। পার্ক স্ট্রিটে অবশ্য রাত বলে কিছু নেই। দশতলা পার্ক টেরেসের সামনে আসতে না আসতে দেখলাম, সত্যি সত্যিই একটা মেয়েকে কাঁধের ওপর ফেলে বেরিয়ে আসছে একজন লোয়ার ক্লাসের লোক। পেছনে আরও দুজন। ওরা এসে দাঁড়াল একটা উইলিজ জিপের সামনে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে মোড় ঘুরল আমার জিপ। ফুলস্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। টহলদারি পুলিশকার হলে অত জোরে ছুটত না। ধড়িবাজ মেয়েচোরেরা তা বুঝেই বোধহয় মেয়েটাকে ফুটপাতে ফেলেই ফের ঢুকে পড়ল পার্ক টেরেসে।

মহা পড়ে পড়লাম তাই দেখে। মেয়েটাকে সামলাব, না স্কাউনড্রেলগুলোর পেছনে দৌড়াব। বুড়ো বয়েসে আমি তো আর ছুটতে পারি না। পার্ক টেরেসের বাড়িখানাও চাট্টিখানি কথা নয়। ফ্ল্যাটের সংখ্যাই তো আড়াইশ। শয়তান তিনটে কোথায় লুকিয়েছে দেখতে হলে আরও সেপাই চাই। আমি তাই মেয়েটাকে জিপে চাপিয়ে একজন সেপাই

নিয়ে ফিরে এলাম থানায়। পরে ভ্যানভর্তি সেপাই পাঠালাম বটে কিন্তু ওদের আর টিকি দেখতে পেলাম না। উইলিজ জিপটাও নাকি চোরাই জিপ।

চুলোয় যাক সেকথা। ফ্যাসাদের শুরু হল থানায় ঢুকতেই। দেখি কি আমার অফিস ঘরে বসে অবিকল, ওই রকম চেহারার একটা মেয়ে। বলব কি মশায়, ঠিক যেন সন্দেশের ছাঁচে তৈরি মুখ চোখ। যমজ। বুঝেছেন? বউমা, অমন চোখ বড় বড় করে অকিও না মা। আরও আছে। শেষকালে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতেও পারে।

অজ্ঞান মেয়েটার জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করলাম। যমজ বোনের পরিচয়ও পেলাম। হিমি আর হিমা। বড়লোকের মেয়ে মশাই। আদুরে আদুরে চেহারা। আইবুড়ো। অথচ বাপ এখনই দশতলা বারোতলা বাড়িতে একটি করে ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন। ব্ল্যাকমানির খেলা তো, বলবার কিছুই নেই। মেয়েগুলিও হয়েছে তেমনি।

মরুকগে! ওদের কথা শুনব বলে বসতে না বসতেই রাতবিরেতে আর এক আপদ। বলুন দিকি কি আপদ? কল্পনাও করতে পারবেন না মশাই। মৃগাঙ্কবাবু অবশ্য আমাকে নিয়ে ঠেসে ক্যারিকেচার লিখছেন, কিন্তু বললে রাগ করবেন জানি–ওঁর কল্পনা শক্তিও তো তেমন নয়।

বউমার মুখ ভার হল কেন? আসল কথা না বলে, বাজে কথা বলছি বলে? বুড়ো হয়েছি তো। রিটায়ারের সময় হয়ে এল। এখন একটু ফালতু কথা বলে ফেলি। কিছু মনে

কোরো না। কী বলছিলাম? ও হ্যাঁ। আর একটা আপদ। ধরতে পারেননি তো কি আপদ? মেয়েছেলে মশায়, আর একটা মেয়েছেলে। ভোর চারটের সময়ে হন্তদন্ত হয়ে থানায় ঢুকল আর একটা মেয়েছেলে। অবিকল অন্য দুজনের মতো দেখতে।

বললে না পেত্যয় যাবেন মশায়, থানাশুদ্ধ লোক ব্যোমকে গেল তিন তিনটে একই ছাঁচের সন্দেশ দেখে। সরেশ সন্দেশ। কিন্তু এরকম কাণ্ড কখনও দেখিনি হোল লাইফে। যমজ পর্যন্ত দেখেছি, কিন্তু...কিন্তু...তিনটে মেয়ে একই ডিম ফুটে বেরোলে কী বলা উচিত মৃগাঙ্কবাবু?...এমজ? ঠিক, ঠিক! এমজ! এমজ বোনই বটে। নামও শুনলাম তিন নম্বরের। হিমু। মানে, হিমি, হিমা আর হিমু হল

অনেক রাত্রে গ্র্যান্ড হোটেলের বিউটি কনটেস্ট থেকে। তিনজনেই ড্রেসিং টেবিলে একটা করে চিঠি পেয়েছে। তিনজনের চিঠিতেই লেখা আছে–বাপের পকেট থেকে লাখখানেক টাকা খসিয়ে না আনলে, খাঁচায় পোরা হবে সেই রাতেই। রাজি থাকলে জানলায় টর্চের আলো জ্বেলে রাখতে হবে একটানা এক মিনিট রাত ঠিক দুটোর সময়ে।

রূপকথা শোনাচ্ছি, ভাববেন না যেন। খাস কলকাতায় এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা মোহন সিরিজকেও টেক্কা মারতে পারে মশাই। সাঙ্কোপাঞ্জা শুধু রোমাঞ্চের পাতায় কেন, এই শহরেই আকচার ব্যাচেলার কিনা ভগবান জানেন–একা একা ফ্ল্যাটে থাকে–বাপ-মা অন্যবাড়িতে ফুর্তি করে নাগর নাগরী নিয়ে–এ ভাবা যায় না!

এই দেখুন, আবার আলতু-ফালতু বকতে আরম্ভ করেছি। দেখছি, আমার নিজেরই ব্যারাকার্ব খাওয়া উচিত। হোমিওপ্যাথি ওষুধ মশাই, বাঁচালতার দাওয়াই।

যাচ্চলে, আবার সব গুলিয়ে গেল। ও হ্যাঁ...হিমা আর হিমু চালাক মেয়ে। চিঠি পেয়েই টর্চ জ্বালিয়ে সঙ্কেত করেছে জানলায়। হিমি করেনি। ভয়ের চোটে সটান ফোন করেছে আমাকে। তারপর টেলিফোনে খবর দিয়েছে দুই বোনকে। টেলিফোন পেয়েই ওরা দুজনেই ছুটে এসেছে থানায়। এবার শুনুন, আসল কারবারটা!

তার আগে মা লক্ষ্মী, একটু চা-টা হবে? কফি-টফি না হলে গলাটা ইদানীং বড় শুকিয়ে যায়। আসছে? বেশ! বেশ! মা লক্ষ্মী আমাদের সাক্ষাৎ শচী দেবী–মৃগাঙ্কবাবু ভাগ্যবান ব্যক্তি। আমার গিন্নিটি হয়েছে বেয়াড়া টাইপের। কেউ চা চাইলেই এমন মুখখানা করবে, যেন ঘরে চিনি নেই।

গেল যা। আবার অন্য লাইনে চলে এসেছি। সেদিন একটা আমেরিকান নাটক দেখলাম মশাই। আমার হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা। এক বুড়ো আর এক বুড়ি। দুজনেরই দ্বিতীয় বিয়ে। দুজনেই খালি খুলে যায়। দুজনেই এক পার্টনারের স্মৃতি, আরেক পার্টনারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছে। আমার হয়েছে...।

ধুত্তোর! কী বলছিলাম? ও হ্যাঁ...আসল কারবারটা। আসল কারবারটাই বলা হয়নি এতক্ষণ। হিমি, হিমা আর হিমুর মাটি হলেন আর এক শচী দেবী। এই...এই...এই

দ্যাখো মা! কী বলতে কী বলে ফেললাম। ইন্দ্রজায়া শচী দেবীর একটা মস্ত দুর্নাম আছে, জানো তো? যখন যার, তখন তার। পুরোনো ইন্দ্রকে হটিয়ে স্বর্গটা যে দখল করবে, শচী দেবী হাসি হাসি মুখে অমনি তার হেঁসেল ঠেলতে আরম্ভ করে দেবেন। হিমি, হিমা আর হিমুর জননীটি অনেকটা তাই। মানে, সোসাইটি গার্ল। গার্ল এককালে ছিল–এখন পাক্কা লেডি। ফাংশন, মিটিং, পার্টি নিয়েই ব্যস্ত। স্বামীর নাম? এখনও বলিনি? হ্যাঃ হ্যাঃ! এই জন্যেই বোধ হয় ডি-সি পোস্টে প্রোমোশনটা আটকে গেল আমার। ভদ্রমহিলার স্বামী মস্ত কারবারি। কোচিন থেকে নারকেল এনে কলের ঘানিতে পিষে তেল বার করে সাপ্লাই দেন নানা কোম্পানিতে। বি-এম-পি তেলের নাম শোনেননি? খাঁটি নারকেল তেল বলতে আর কিছু নেই এদেশে।

কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার পর ভদ্রলোকের মতিভ্রম হয়েছে বোধ হয়। বিশেষ করে প্যারালিসিসে কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত অবশ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মাথায় নাকি ভূত চেপেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবসার পরিকল্পনা কাঁদছেন। মানে, শেষ পর্যন্ত কারবারটাকে তুলে দেওয়ার মতলব আর কি।

একটা প্ল্যান শুনবেন? কোচিন আর সিলোন থেকে জাহাজ-ভর্তি নারকেল এনে নাকি পোষাচ্ছে না। ঠিক করেছেন, চাষ করবেন নিজের দেশেই। সুন্দরবনে নারকেল ফলিয়ে দেশের চেহারা পাল্টে দেবেন। হাসবেন না! হাসবেন না। প্ল্যানটা একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের গায়ে যে রিজার্ভ ফরেস্ট আছে, সেখানকার নোনা মাটি আর আবহাওয়া

নাকি নারকেল চাষের উপযুক্ত। উনি ঠিক করেছেন সেখানে এক লাখ নারকেল চারা লাগাবেন। মোটামুটি আট থেকে দশ বছরের মধ্যে ফল দেবে এক-একটা নারকেল গাছ। গাছ যতদিন বাঁচবে, ফলও তদ্দিন মিলবে। এক লাখ চারার মধ্যে পঁচাত্তর হাজার চারাও যদি বেঁচে থাকে, মন্দ কি? গাছ পিছু বছরে মাত্র একশো টাকার নারকেল ধরলেও, বছরে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা নীট লাভ।

শুধু কি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা? নারকেল তেল, নারকেল দড়ি ইত্যাদির জন্যেও কলকারখানা গড়ে তোলা যাবে ওখানে। ফলে, সুন্দরবন অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। সুন্দরবনে হঠাৎ ক্রাইম বেড়ে যাওয়ায় কর্তাদের গরম মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে। হাতে পয়সা এলে চুরি-ডাকাতির সাধ কার থাকে বলুন?

গভর্নমেন্ট প্রকল্পটি লুফে নিয়েছেন। রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে জমিও দিয়েছেন। তাইতেই লেগেছে গৃহবিবাদে। মানে বি-এম-পি অয়েল মিলের মালিক সনাতনপ্রসাদের সঙ্গে তার বিদুষী বিবি অহল্যার।

নামখানা শুনেছেন? অহল্যা। মেয়েদের মুখে শুনলাম, মা নাকি সত্যিই অহল্যা রূপের দিক দিয়ে। বাবা এই রূপ দেখেই টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন ভদ্রমহিলাকে। মেয়েদের জুলুষ দেখলেই অবশ্য খানিকটা আঁচ করা যায়। কিন্তু মায়ের ছিটেফোঁটাও নাকি ওদের বরাতে জোটেনি।

কী বলছিলাম মা লক্ষ্মী? কর্তা-গিন্নির ঝগড়ার কথা, তাই না? সুন্দরবনে নারকেল চাষ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই খিটিমিটি লেগেছে, বাপ-মায়ের মধ্যে, বলল এমজ মেয়েরা। সনাতনপ্রসাদ নাকি নিজে তো মরতে বসেছেন, মরার আগে কারবার পর্যন্ত মেরে যাবেন।

যাকগে সেসব ঘরোয়া কেচ্ছা। মেয়ে তিনটের ওপর এই সময়ে নেকনজর পড়ল কোন হারামজাদাদের, জানবার জন্যে শুরু করলাম তদন্ত। সেরকম তদন্ত, কিছু মনে করবেন না ইন্দ্রনাথবাবু, আপনিও পারবেন না। অত ঝক্কি সইবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। মৃগাঙ্কবাবু অবিশ্যি রুটিন তদন্ত বলে যথেষ্ট বিদ্রূপ করেন আমাদের পদ্ধতিকে। কিন্তু রুটিন তদন্তে একবার করতে আসুন না। কাছা খুলে যাবে।

তদন্তর ফিরিস্তি দেব না। তবে কি জানেন, তদন্তই সার হল। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মতো আর কি। মেয়ে তিনটেকে কিছুতেই ফ্ল্যাট থেকে সরানো গেল না। সনাতনপ্রসাদের স্পেশাল রিকোয়েস্টে কনস্টেবল বসিয়ে রাখলাম ফ্ল্যাটের গোড়ায় দিন কয়েকের জন্যে। কিন্তু সাতটা দিনও গেল না।

এবার আসছি আসলের আসল ব্যাপারে। রিয়াল মিস্ট্রি এইখানেই। কান খাড়া করে শুনুন মৃগাঙ্কবাবু। দয়া করে, নেক্সট গল্পে আমাকে একটু ক্রেডিট দেবেন।

সনাতনপ্রসাদের ফ্যাক্টরিতে কিছুদিন আগে বিশ্রী লেবার মুভমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। জানেন তো, আজকালকার শ্রমিক-কর্মচারীরা কোম্পানির ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবে। ম্যানেজমেন্টকে যা খুশি তাই করতে দেয় না। ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সনাতনপ্রসাদ তার ধার ধারেননি। সুন্দরবনে নারকেল চাষ প্রসঙ্গে সরাসরি সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে নেমেছেন। ফলে, আতঙ্ক দেখা দিয়েছে কারখানায়। লিডাররাও কিছু একটা না পেলে লেবার তাতাতে পারে না। এই ইস্যু নিয়ে ওরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল কারখানায় যে, সনাতনপ্রসাদের প্রাইভেট কোয়ার্টারের সামনে সি-আর-পি বসাতে হল চৌপর দিনরাত।

আরও খবর পেয়েছি মশাই। অহল্যা দেবী নিজেও নাকি কারখানার লোককে খেপিয়ে তুলেছেন। লিডারদের ডেকে উস্কে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, কাটা দিয়ে কাঁটা তোলা। শ্রমিকদের চাপে যেন স্বামীরত্ন ভড়কে যান এবং নারকেল চাষ শিকেয় তুলে রাখেন। বড় ঘরের বড় ব্যাপার। দেখে দেখে চোখ পচে গেল।

হঠাৎ হিমি-হিমা-হিমুর কেস টেকআপ করার সাতদিন পরে, একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল সেদিন রাত্রে একটা বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন গিয়েছিলেন অহল্যাদেবী। আত্মীয় বাড়ির নেমন্তন্ন। মাঝরাতে লগ্ন। তাই ঠিক করেছিলেন, ভোররাতে ফিরবেন। রাত নটার সময়ে সেজেগুজে নীচে নেমেছিলেন। কারখানার পাশেই ওদের কোয়ার্টার। সি-আর-পি-দের

বলেছিলেন, কর্তা একলা রইল। যেন একটু নজর রাখা হয়। আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন, আলো জ্বলছে তিনতলায়। বলেছিলেন, একটু বরং দাঁড়িয়ে যাই। আলো নিভিয়ে উনি শুয়ে পড়লে যাব। ড্রাইভারও দেখেছে আলো জ্বলছে। তারপর সবার সামনেই আলো নিভে গেল। অর্থাৎ সনাতনপ্রসাদ মাথার কাছে বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমের আয়োজন করছেন। তিনতলায় আর কেউ থাকে না–অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা ছাড়া। সনাতনপ্রসাদ কাউকে বিশ্বাস করেন না রাত্রে–কুকুর ছাড়া।

অহল্যা দেবী তিনতলার দরজায় নিজে চাবি লাগিয়েছিলেন। একটা চাবি ছিল ভেতরে–সনাতনপ্রসাদের বালিশের তলায়। দরজায় ইয়েল লক লাগানো ছিল। একবার চাবি লাগালে নিশ্চিন্ত। বিয়েবাড়ি যাচ্ছেন বলে হ্যান্ডব্যাগ রাখেননি। তাই চাবির গোছা রাখতে দিয়েছিলেন ড্রাইভারকে। বিদূষী বিবি তো–আপটুডেট লেডি। আঁচলে চাবি বাঁধলে ইজ্জত চলে যায়।

পরের দিন সকালবেলা কুকুরের হাঁক-ডাকে চমকে উঠল কারখানার দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে সি-আর-পি পর্যন্ত। চাকরবাকররা দোতলা থেকে ছুটে গেল তিনতলায়। সবাই শুনলে, অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা ভেতর থেকে দরজা আঁচড়াচ্ছে আর ভীষণ চেঁচাচ্ছে। কোনওদিন কিন্তু এভাবে চেঁচায় না।

আচ্ছা জ্বালা তো! দরজা খোলারও উপায় নেই। চাবি মেমসাহেবের কাছে। ঘরে আলোও জ্বলছে। কিন্তু সাহেব তো কুকুরটাকে ধমক দিচ্ছেন না?

ভোর ছটায় এসে পৌঁছোলেন অহল্যা দেবী। কুকুরে হাঁক-ডাক শুনে আর দরজার সামনে চাকর-বাকরের জটলা দেখে ড্রাইভারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুললেন। কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন করিডরের দিকে। তারপর ফিরে এসে গেলেন বেডরুমে।

চাকরবাকররা ছুটে গেল চিৎকার শুনে। দেখল, সনাতনপ্রসাদ মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। চোখ খোলা। মুখের ওপর মাছি উড়ছে।

জানেন তো, মরা হাতির দাম লাখ টাকা। ডাক পড়ল এই ঘাটের মড়া অবনী চাটুয্যের। চুলেচেরা রুটিন তদন্ত করে তো মশাই বিলকুল ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। ঘর বন্ধ। চাবি ড্রাইভারের কাছে। আর একটা চাবি সনাতনপ্রসাদের বালিশের তলায়। বিয়েবাড়ির সবাই সাক্ষী–অহল্যা দেবী আর ড্রাইভার দুজনেই বাড়ি ছেড়ে নড়েননি। সনাতনপ্রসাদেরও বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। বেড সুইচ টিপে না হয় আলো নিভিয়েছিলেন রাত নটায়। কিন্তু আলোটা জ্বালল কে? সারারাত আলো জ্বলেনি–সি-আর-পিরা সাক্ষী। ভোরবেলা বন্ধ ঘরে আলো জ্বালল কে? সনাতনপ্রসাদ? কি যে বলেন। তিনি তো তখন মরে ভূত। ময়নাতদন্তে দেখা গেল, তিনি হার্টফেল করেছেন রাত নটা থেকে দশটার মধ্যে। মানে আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর ঘুমের মধ্যেই স্থূল শরীর ত্যাগ করেছেন। আলোটা তাহলে জ্বালল কে? ভূত? অ্যালসেশিয়ানের পক্ষেও সম্ভব নয় দাঁতে কামড়ে আলো জ্বালানো। সেক্ষেত্রে সুইচে দাঁতের দাগ থাকত। মনিব মারা গেছে বুঝেই সে

দরজা খুলতে চেষ্টা করেছে, চেঁচিয়েছে–সুইচ টিপে আলো নিশ্চয় জ্বালায়নি। কে টিপল বেড সুইচ? তবে কি সি-আর-পি-রা মিথ্যে বলছে? আলো সারারাত জ্বলে ছিল, কিন্তু ব্যাটারা ঘুমোচ্ছিল বলে দেখেনি? এখন মানতে চাইছে না?

একটা স্ট্রোকের ফলেই শুয়ে পড়েছিলেন সনাতনপ্রসাদ। চিন্তাভাবনাও ইদানিং খুব বেড়েছিল। হার্ট আর অত ধকল সইতে পারেনি। ফাইনাল স্ট্রোকেই শেষ হয়ে গেছেন। বিধাতার কি লীলা। এত টাকার মালিক! মৃত্যুকালে মুখে জলটুকুও পেল না। কারও দেখা পেল না। তা না হয় হল, কিন্তু আলোটা জ্বালল কে?

না, না, যা ভাবছেন তা নয়। আলো যে জ্বেলেছে, তার নাম জানতে আমি আসিনি। শোনাতে এসেছি। বুঝলেন না? কে আলো জ্বেলেছে, সবই মোটামুটি আঁচ করে ফেলেছি। না, না, আমাকে বলতে দিন..পুলিশ গোয়েন্দারা ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। আমাদেরও ব্রেন আছে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, কারখানার ওয়ার্কস ম্যানেজারের সঙ্গে অহল্যা দেবীর একটু গুপ্ত প্রণয় ছিল। ভদ্রলোক খুবসুরৎ। বিলেত-ফেরত। ব্যাচেলর। আর কী চাই বলুন? আরও খবর পেয়েছি–পতিদেবতাকে রোজ স্বহস্তে ওষুধ খাওয়াতেন অহল্যা দেবী। এ ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করতেন না সনাতনপ্রসাদ। শুনবেন আরও? সনাতনপ্রসাদের হার্ট হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলছিল বলে একটা ওষুধ দেওয়া হত যার পাঁচ ফোঁটা মানে অমৃত, দশ ফোঁটা মানে বিষ-হার্টের রুগির পক্ষে। দোহাই মৃগাঙ্কবাবু, ওষুধটার নাম জিগ্যেস করবেন না। আপনারা–লেখকরা বড় অবিবেচক হন। যা শুনবেন তাই লিখবেন, তারপর আরও একশোটা খুনের কেস নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে

হতে হবে আমার মতো অনেক বান্দাকে। একটু বুঝেসুঝে লিখবেন মশাই। জানেন তো, শতং বদ মা লিখ।

আচ্ছা মুশকিল তো, আবার বেরুটে চলে গেলাম। আসল কথাটাই তো এখনো বলিনি। বিয়েবাড়িতে যাওয়ার আগে কর্তা-গিন্নিতে বেশ খানিকটা বচসা হয়েছিল। চাকরবাকররা শুনেছিল। চড়া গলায় ধমক দিয়েছিলেন সনাতনপ্রসাদ। অহল্যাও দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরই সেজেগুজে হোল নাইট বাইরে থাকবেন বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অহল্যা। যাবার আগে সেই বিশেষ ওষুধটা খাইয়ে গিয়েছিলেন কর্তাকে রোজকার মতো রাত নটায়।

এখন কথা হচ্ছে কটো খাইয়েছিলেন? আমি বলব দশ ফোঁটা–মানে সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিলেন সনাতনপ্রসাদ। প্রমাণ এখনও পাইনি; কিন্তু বিষয় মানেই বিষ–বিষয়ের লোভে সবই সম্ভব। আর এখানে তো নাগর জুটেছে। ঘরে পঙ্গু স্বামী কঁহাতক আর সহ্য করা যায়? সুতরাং পতিদেবতাকে তিনিই সরিয়ে দিয়েছেন ধরে নিলাম। কিন্তু আলোটা কীভাবে জ্বলল সেইটাই তো বুঝতে পারছি না।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, এখনো শেষ হয়নি। আরও একটা জবর খবর শুনিয়ে দিই। শোনবার পর কিন্তু চোখ দুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারে মা লক্ষ্মী। সাবধান! সাবধান!

হিমা-হিমি-হিমু, এই মজকে ফ্ল্যাট থেকে লোপাট করার ষড়যন্ত্রটি কে এঁটেছিল জানেন? কল্পনা করুন তো। পারলেন না তো? দুয়ো! দুয়ো! স্বয়ং গর্ভধারিণী মশাই। অহল্যা দেবী নিজে লোক লাগিয়ে মেয়েদের লোপাট করতে চেয়েছিলেন। কেন? কেন আবার–মেয়েরা কোনও গতিকে জেনে ফেলেছিল মায়ের হাতে বাবার জীবন বিপন্ন হলেও হতে পারে। অথচ সেকথা সবাইকে বলা যায় না। তাই ওরা ঠিক করল আমার দোর ধরবে। অহল্যা দেবী চলেন শিরায় শিরায়। মেয়েদের মতলব টের পেয়ে পুলিশের নজর অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে ইচ্ছে করেই মেয়েদেরকে গায়েব করতে আরম্ভ করলেন। আসলে পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। অর্থাৎ সেই রাতে আমাকে স্রেফ বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন অহল্যা দেবী তাঁর ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে। মেয়েরাও বিহ্বল হয়ে পড়ল হঠাৎ এই উৎপাতে। বাপের কথা খেয়াল রইল না।

তার সাতদিন পরেই কাজ হাসিল করে ফেললেন অহল্যা দেবী। তিনি জানেন, মেয়েরা বাপকে বাঁচাতে চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু মাকে ফাঁসাতে চায়নি। পুলিশের কাছে এলেও তারা মায়ের নাম করত না। বাবা মারা যাওয়ার পর তো আরও বোবা হয়ে যাবে। সনাতনপ্রসাদ মারা যেতেনই–না হয় দুদিন আগেই তার কষ্ট ঘুচিয়ে দেওয়া হল। মাকে ফাঁসিয়ে ঘরোয়া কেলেঙ্কারি ফাঁস করে আর লাভ আছে কী?

বলব কি মশায়, গোটা ফ্যামিলিটাই যেন কেমনতর। সব ছাড়া ছাড়া। অথচ তালে হুঁশিয়ার। মা থেকে মেয়েরা পর্যন্ত কেউ একটি কথাও ফাস করেনি। কিন্তু আমার নাম অবনী চাটুয্যে। ঠেঙিয়ে নকশাল তাড়িয়েছি। কি বললেন? খুব বাহাদুরি করেছি? চাকরি

মশাই, চাকরি! চাকরি করতে গেলে নিজের ছেলেকেও ফাটকে পুরতে হয়, নকশাল তো ছার!

এখন বলুন, প্লটটা নিচ্ছিদ্র কিনা। বেশ বুঝতে পারছি, সনাতনপ্রসাদ এমনি এমনি মরেননি। কিন্তু শালা কিছুতেই তা প্রমাণ করতে পারছি না। নিচ্ছিদ্র প্লটে একটা ছিদ্রও আবিষ্কার করতে পারছি না। একি গেরোয় পড়লাম বলুন তো? আলোটা কে জ্বেলেছে, তা তো জানি। কিন্তু জ্বালল কী করে তাইতো বুঝছি না। বেশ বুঝছি, ছিদ্রটা ওইখানেই। ওই ছিদ্রটা আবিষ্কার করতে পারলেই ফাঁসিয়ে দেব অহল্যা দেবীকে।

ম্যারাথন বক্তৃতা থামতেই কবিতা বললে, আপনার কফি জুড়িয়ে গেল। চাইনিজ শ্রিম্প বলগুলো পর্যন্ত ইটের গুলি হয়ে গেল।

আঁ! কখন এল এসব? বলোনি তো? আঁতকে উঠে প্লেটভর্তি চিংড়ি পকৌড়া আক্রমণ করলেন অবনী চাটুয্যে।

বলতে দিলেন কই? যতবার মুখ খুলতে গেলাম, ততবারই তো দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দিলেন।

মুখভর্তি পকোড়া নিয়ে অঁ-অঁ-অঁ-অঁ করে কি যেন বললেন অবনী চাটুয্যে, বোঝা গেল না।

হাসি চেপে ইন্দ্রনাথ বলল, আস্তে আস্তে খান, বিষম লেগে যাবে। খেয়ে নিয়ে চলুন ঘরটা দেখে আসি।

কোঁৎ করে গিলে নিয়ে বললেন, অবনীবাবু, কার ঘর?

সনাতনপ্রসাদের।

হা পোড়া কপাল! সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাবা! আরে মশায়, এখনো বুঝলেন রুটিন-তদন্তে আমরা কিছুই বাদ দিই না?

রুটি আর লুচির মধ্যে যা তফাত, আপনার রুটিন-তদন্ত আর আমার লুচিন তদন্তেও সেই তফাত অবনীবাবু।

মানে? মানে? মানে? এত অবিশ্বাস আমার ওপর কেন? বলেই খপাৎ করে আরও দুটো পকৌড়া মুখগহ্বরে ঠেসে দিলেন অবনীবাবু।

দেখবেন শ্বাসনালীতে যেন আটকে না যায়। বলল ইন্দ্রনাথ, আপনি এত সুন্দরভাবে সব কথা বললেন যে, অবিশ্বাস করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। জ্বলন্ত বর্ণনা যাকে বলে–

আপনার বর্ণনাও তাই। বায়োস্কোপের ছবির মতো সব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বলেই একটা খটমট জায়গা ভেরিফাই করতে চাই।

মুখভর্তি পকৌড়া চিবোনো বন্ধ করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন অবনীবাবু। ভাবখানা- খটমট জায়গাটা আবার কোথায় দেখলেন মশায়?

ইন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলে, অহল্যা দেবী বিয়েবাড়ি থেকে এসে দরজা খুলেই কিন্তু বেডরুমে যাননি–যা সবাই যায়। উনি কুকুরটাকে নিয়ে করিডরে গেলেন। কেন?

চোখদুটো আস্তে আস্তে ছানাবড়ার মতো করে ফেললেন অবনীবাবু।

ইন্দ্রনাথ আরও বললে, উনি কি তাহলে জ্ঞানপাপী? উনি কি জানতেন, শোবার ঘরে স্বামীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে? কুকুরের অস্বাভাবিক চেঁচামেচির পর দরজা খুলেই ওঁর উচিত ছিল অসুস্থ স্বামীর কাছে ছুটে যাওয়া। কিন্তু কেন উনি করিডরে গেলেন, আমি গিয়ে দেখতে চাই।

কণ্ঠনালী দিয়ে মস্ত ডেলাটাকে পাকস্থলীতে চালান করে দিয়ে বললেন অবনীবাবু, একটু দাঁড়ান। আর মোট চারটে আছে।

.

ইন্দ্রনাথ আগে থাকতেই শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল অবনীবাবুকে।

সনাতনপ্রসাদের ঘরে ঢুকে তাই অবনী চাটুয্যে সোজা চলে গেলেন বেডরুমে। অহল্যা দেবীকে আবোল তাবোল কথায় আটকে রেখে দিলেন সেখানে।

ইন্দ্রনাথ এল করিডরে। ঢুকেই বাঁদিকে। শেষপ্রান্তে একটা কাঠের বাক্স। অ্যালসেশিয়ানের শোবার জায়গা। বাক্সটা তখন খালি। কুকুর বেরিয়েছে চাকরের সঙ্গে হাওয়া খেতে।

ইন্দ্রনাথ আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, কী করতে হবে। তাই হেঁট হয়ে কাঠের বাক্সটা সরিয়ে রাখল পাশে।

বাক্সর তলায় একটা ময়লা লিনোনিয়াম পাতা। লিনোনিয়ামটাও তুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ।

তলায় একটা কাঠের পাটাতন। লম্বায় একফুট, চওড়ায় একফুট। দেওয়ালের গা ঘেঁষে কাঠের ঢাকনির গায়ে পেনসিল ঢোকানোর মতো একটা ফুটো।

ছিদ্রপথে কড়ে আঙুল ঢুকিয়ে পাটাতনটা উঠিয়ে ফেলল ইন্দ্রনাথ। মেঝের চৌকোণা গর্তে একটা বাক্স বসানো। ইলেকট্রিক মিটার আর মেন সুইচের জঙ্গল সেখানে। হালফ্যাসানের বাড়ি তো–দেওয়ালের গায়ে কিছু নেই।

পকেট থেকে টর্চ বের করে খুঁটিয়ে দেখল ইন্দ্রনাথ। কাঠের ঢাকনির যেখানে ফুটো, ঠিক তার তলায় কাঠের গায়ে দুটো ছোট ছোট ছিদ্র। যেন স্ক্রু লাগানো ছিল। মেন সুইচের মাথা থেকে দুটো তার বেরিয়েছে। একটা তারে কিন্তু ব্ল্যাকটেপ জড়ানো।

সন্তর্পণে ব্ল্যাক টেপ খুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ তার না ছুঁয়েই। তারটা সত্যিই কাটা। দুটো প্রান্ত জুড়ে ব্ল্যাক টেপ দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে।

বাক্সের তলায় ছোট্ট একটা টুকরো। সোলার ছিপির টুকরো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

ফিরে এল শোবার ঘরে। অহল্যা দেবী গালে হাত দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে শুনছেন অবনীবাবুর ফালতু বক্তিমে।

ভদ্রমহিলা নিঃসন্দেহে অপূর্ব সুন্দরী। খুঁত কোথাও নেই। বয়স হয়তো তিরিশ, মনে হচ্ছে আরও কম।

ইন্দ্রনাথকে দেখেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন অবনীবাবু। চোখের মধ্যে প্রশ্ন ফুটিয়ে জানতে চাইলেন–হল কিছু?

গম্ভীর মুখে পলকহীন চোখে অহল্যা দেবীর পানে চেয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, নমস্কার, আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনার কাছে শুধু দুটি জিনিস চাইতে এলাম।

প্রতি নমস্কার করলেন অহল্যা, বলুন।

একটা কলিংবেলের টেপা সুইচ। আর একটা ছোট্ট সোলার ছিপি।

নিমেষ মধ্যে নিরক্ত হয়ে গেলেন অহল্যা।

অবনীবাবুর পানে ফিরে বলল ইন্দ্রনাথ, এখন গ্রেপ্তার করতে পারেন। প্রমাণ পাওয়া গেছে।

.

আবার চিংড়ি পকৌড়া। আবার কফি। আবার সরগরম বৈঠক।

ইন্দ্রনাথ বললে, ছিদ্রান্বেষী ছিদ্র খুঁজতে গিয়ে সত্যি সত্যিই ছিদ্র বের করে ফেলল।

সেটা কিন্তু এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। উৎকট গম্ভীর হয়ে বললাম আমি।

ইহজন্মে হবে না। অবনীবাবু নিচ্ছিদ্র প্লটের ছিদ্রটা তার অজান্তেই শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তোরা প্রত্যেকে শুনেছিস। আমিও শুনেছি কিন্তু ওই যে বললাম, যার চিন্তার ডিসিপ্লিন, বুদ্ধির একাগ্রতা আর পর্যবেক্ষণ প্রয়োগশক্তি আছে–সে ছাড়া গোয়েন্দা হওয়া কাউকে সাজে না। তাই নিচ্ছিদ্র প্লটের ছিদ্র আমার মাথায় এসে গেল, তোদের মাথায় এল না।

কবিতা একদম না ঘাঁটিয়ে ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলল, হার মানছি ঠাকুরপো। কিন্তু আর সাসপেন্সে রেখো না। প্রেশার উঠে যাচ্ছে।

প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, আমি এইখানে বসেই আঁচ করেছিলাম, আলোর তারে এমন কিছু কারচুপি করা হয়েছিল যা অহল্যা দেবীর অনুপস্থিতিতে আপনা থেকেই আলো নেভাবে বা জ্বালাবে। ঘরের মধ্যে প্রাণী ছিলেন দুজন। সনাতনপ্রসাদ আর কুকুর। সনাতনপ্রসাদ চলৎশক্তিহীন এবং আলো যখন জ্বলেছে বা নিভেছে–তখন তিনি মৃত। জীবিত প্রাণী বলতে রইল শুধু কুকুরটা। কুকুরটার সঙ্গে আলো জ্বলা নেভার কোনও সম্পর্ক নেই তো? অহল্যা দরজা খুলে ঢুকেই কুকুরটাকে নিয়ে করিডরে গেছিলেন কেন? করিডরেই কারচুপিটা নেই তো? হতে পারে কুকুরটা না জেনেই পুশ বাটনে চাপ দিয়ে

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে অথবা জ্বালিয়েছে। কিন্তু নিভেছে রাত্রে– কুকুরের শোবার সময়। জ্বলেছে ভোরে কুকুরের ওঠার সময়। তবে কি শোবার জায়গাটাতেই টেপা সুইচটা আছে?

তাই তিনতলায় গিয়ে আমি আগে গেলাম করিডরে। দেখলাম, সত্যিই কুকুরের শোবার বাক্স রয়েছে সেখানে। সুসংবদ্ধ চিন্তা আর শৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তির প্রথমটি যদি সঠিক হয়, পরেরগুলোও সঠিক হতে বাধ্য। তাই বাক্স সরাতেই কী-কী পেলাম তা আগেই বলেছি।

মেন সুইচের একটা তার কেটে, সেই তারে বাড়তি তার জুড়ে এনে লাগানো হয়েছিল একটা টেপা সুইচে। সুইচটা ভ্রু দিয়ে লাগানো হয়েছিল কাঠের ডালার ছোট্ট ফুটোর ঠিক তলায়। সুইচের ভেতরে কনট্যাক্ট প্লেট দুটোকে ইচ্ছে করে বেঁকিয়ে এমন জায়গায় রাখা হয়েছিল, যাতে বাক্সের মধ্যে কুকুর শুলেই ঢাকনি চেপে বসবে সুইচের ওপর। ফলে কনট্যাক্ট কেটে যাবে। মানে আলো নিভে যাবে। কুকুরটা বাক্স থেকে নেমে এলেই ডালাটা সুইচের ওপরে উঠে যাবে–আলো জ্বলে উঠবে। অর্থাৎ পুশ বাটন টিপে ধরলে আলো জ্বলে, ছেড়ে নিলে নেভে। এই সুইচে ঠিক তার উল্টো ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। টিপলে নিভবে, ছাড়লে জ্বলবে।

কিন্তু ছিপিটার ভূমিকা কী? শুধোলাম আমি।

কাঠের ঢাকনিটা সুইচের মাথায় ঠেকছিল না বলেই ফুটো দিয়ে সোলার ছিপি এঁটে দিয়েছিলেন অহল্যা দেবী। ছিপির তলাটাই সুইচের ওপর চেপে বসে আলো নিভিয়েছে কুকুরের শোবার সময়ে। ঘরে ঢুকেই ওই ছিপিটা সরিয়ে নেবেন বলে অহল্যা দেবী আগে করিডরে গিয়েছিলেন। পুশ বাটন সরিয়েছেন পরে ধীরে সুস্থে।

বিমূঢ় কণ্ঠে কবিতা বললে, দরজা বন্ধ করে অহল্যা দেবী নীচে নামার আগেই তো কুকুরটা বাক্সে গিয়ে শুড়ে পড়তে পারত! তাহলে তো আলো নেভার ব্যাপারে সি-আর-পি-দের সাক্ষী রাখা যেত না?

হাল ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, জন্মে এমন দেখিনি! আরে বাবা, খানকয়েক বিস্কুট শোবার ঘরে ছড়িয়ে এলেই তো হল! কুকুর বিস্কুট না খেয়ে শুতে আসবে না। ততক্ষণে অহল্যা দেবী নীচে পৌঁছে যাবেন। সি-আর-পি-দের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন– ঘরে আলো জ্বলছে। হয়েছেও তাই। সব কবুল করেছেন অহল্যা দেবী।

ত্রমজ মেয়ে তিনটে? বোকার মতো জিগ্যেস করে ফেলেছিলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠেছিল : মরণ আর কি! সে-খোঁজে তোমার দরকার কী?

জিরো জিরো গজানন

ত্রিশূল এর আমন্ত্রণ

জিরো জিরো গজানন পরপর দুটো ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিয়ে বললে পুঁতিবালাকে, লাশটা কোথায়?

পুঁতিবালা তখন হাঁফাচ্ছে। অনেকটা পথ ছুটে আসতে হয়েছে খবরটা দিতে। একে তো এই পাহাড়ি রাস্তা। ওঠো আর নামো, ওঠো আর নামো। ধুস! দম বেরিয়ে যায়!

বললে জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে–এখন ও রাস্তায়...মানে, বস্তির দিকে যে সিঁড়িটা নেমে গেছে, তার ওপর।

ট্যাবলেট দুটো ততক্ষণে জিভের তলায় মিলিয়ে গেছে। বেশ চাঙ্গা লাগছে গজাননের। আমেরিকান বড়ি। ব্রেনটাকে আঁকুনি মেরে সজাগ করে দেয় চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে।

মোষের শিংয়ের নস্যাধার খুলে এক টিপ নস্যি নিয়ে নাসিকা গহ্বরে সশব্দে চালান করে দিয়ে ভারিক্কি গলায় বললে গজানন, মানে জিরো জিরো গজানন, ওরফে সুপার স্পাই

ট্রিপলজি– পুঁতিবালা, যে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছি, মনে হচ্ছে, এবার তার ভেতরে প্রবেশ করব। এ সময়ে তোমার এই ভয়ংকর হাঁপানিটা সব বানচাল করে দিতে পারে।

পুঁতিবালা নামটা গেঁইয়া হতে পারে, কিন্তু মেয়েটি খাসা। সুপার মডার্ন গার্ল বললেই চলে। গজানন একে আবিষ্কার করেছিল হিন্দ সিনেমার সামনে থেকে। কলগার্ল পুঁতিবালা ষোড়শী বালিকার মতোই ডাগর চোখে উৎসুক পথচারীদের প্রাণে পুলক জাগিয়ে চলেছিল। গোধূলির লাল আভা গণেশ এভিনিউ বেয়ে তার মুখে পড়েছে। চৌমাথায় ট্রাফিক পুলিশ যথারীতি কথাকলি নৃত্য করে যানবাহন জট রুখে দিচ্ছে। পুঁতিবালাকে সে রোজই দেখে। ছেলেছোকরা থেকে আরম্ভ করে প্রৌঢ়রা পর্যন্ত হেসে-হেসে তার সঙ্গে কথা বলে স্কুটার অথবা গাড়িতে চাপিয়ে হু-উ-উ-স করে উধাও হয়। কনস্টেবল পুঙ্গব তা দেখেও দেখে না। আহা, মেয়েটা রোজগার করছে, করুক।

কিন্তু জিরো জিরো গজাননের চোখের কোয়ালিটিই আলাদা। মেন্টাল হোমে থাকতে থাকতেই তার চোখের আর মনের ধার বেড়েছে। ম্যাচুইরিটি এসেছে। ইনটেলেকচুয়াল ম্যাচুইরিটি।

তারপরেই বেপারিটোলা লেনে ভোলা হাউসের ঠিক পেছনের লাল বাড়িটায় পেয়ে গেল একটা ঘর। আশেপাশে কালোয়ারদের আড্ডা। পুরোনো মাল নীলামে কিনে এনে খুলে রকমারি পার্টস চড়া দামে বেচেই এরাই এখন লাখোপতি কোটিপতি। শুধু নীলামে নয়,

চোরাই মালও আসছে এই তল্লাটে। সুতরাং এসপায়োনেজ অ্যাকটিভিটির পক্ষে জায়গাটা উপযুক্ত।

মেন্টাল হোম থেকে বেরোনোর আগেই গজানন ঠিক করেছিল সে স্পাই হবে। নিক কার্টার পড়েছে বিস্তর। জেমস বন্ড তার প্রিয় হিরো। ব্রুস লীর পরম ভক্ত। এই সবগুলো মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার ফলেই যেতে হয়েছিল মেনটাল হোমে। কঁকড়া চুল নেড়ে একদিন লরির ওপর লাফিয়ে উঠে লাথি মেরে উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে দিতেই পা কেটে গেছিলজুক্ষেপ করেনি। কিন্তু লরির ভেতর স্মাগলার তিনজন যখন ছুরি হাতে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গজাননের ওপর–টনক নড়েছিল তখনই।

একটা বাচ্চা মেয়েকে ঠিকরে ফেলে দিয়ে উধাও হওয়ার ফিকিরে ছিল বলেই অসম সাহসিকতাটা দেখিয়ে ফেলেছিল গজানন। নিমেষের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। বেঞ্চিতে বসা ইয়ারবন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা মাথায় উঠেছিল। হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেই নক্ষত্রবেগে ধেয়ে গিয়ে ঠিকরে গেছিল লরির ওপর।

তারপরেই প্রচণ্ড লাথি। ঝনঝন করে ভেঙেছে কাঁচ। থেমেছে লরি। পরমুহূর্তেই ভাঙা কাঁচে রক্তরক্তি ড্রাইভারের পাশে বসা তিন মস্তান বেরিয়ে এসে খোলা ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গজাননের ওপর।

বেলেঘাটা মেন রোডের ওপর বোমা নিয়ে দু-দলে মারামারি নতুন দৃশ্য নয়। কিন্তু সে দিনের সেই দৃশ্য ছিল একেবারে অন্যরকম। তিন-তিনটে ঝকঝকে ছুরি তিনদিকে ঝলসে উঠতেই গজাননের মাথার মধ্যে কী যেন ঘটে গেল। মনে হল পটাং করে একটা টান করে বাঁধা তার ছিঁড়ে গেল। সেতারের তার ছেঁড়ার মতো আওয়াজটা মাথার মধ্যে মিলিয়ে যেতে না যেতেই গজানন হয়ে গেল আর এক মানুষ।

তিন-তিনটে ছুরিধারী মস্তানকে কীভাবে রুখেছিল গজানন, তা তার কিছু মনে নেই। পটাং করে তার ছিঁড়ে যাওয়ার পর থেকেই কী-কী ঘটেছিল, কিসসু মনে নেই।

রাস্তার লোকে দেখেছিল যেন স্বয়ং জেমস বন্ড, ব্রুস লী আর অমিতাভ বচ্চন একইসঙ্গে মিলেমিশে গেছে গজাননের বিদ্যুৎ গতি ক্ষিপ্রতার মধ্যে। ক্যারাটে, মার, লাথি, ঘুসি চলছে এত দ্রুত পরম্পরায় যে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না কী ঘটে চলেছে। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে তিন তিনটে হাত-পা-মাথা ভাঙা জোয়ান ঠিকরে পড়ল বেলেঘাটা মেন রোডের খোলা ড্রেনে পাঁকের মধ্যে।

আর রক্তাক্ত দেহে দাঁড়িয়ে সুন্দরবনের আহত বাঘের মতো সমানে গর্জে চলল গজানন। তিনটে ছুরির একটা তার পেটের চামড়া এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কেটে দিয়েছে, আর একটা গোটা পিঠটাকে কোণাকুণিভাবে চিরে দিয়েছে, তৃতীয়টায় কেটেছে ডান গাল।

বীভৎস মূর্তি নিয়ে তাই হুঙ্কারের পর হুঙ্কার ছেড়ে চলেছে গজানন। চোখ ঘুরছে বনবন করে। দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে হিংস্র হায়নার মতো।

বন্ধুরাই ওকে জাপটে ধরে এবং দশ-দশটা বন্ধু নাকানিচোবানি খেয়ে যায় তাকে মেনটাল হোমে নিয়ে যেতে। স্ট্রেটজ্যাকেট পরিয়ে সেল-এ রাখতে হয়েছিল কিছুদিন। মাথায় শক দিতে হয়নি– স্রেফ শক থেরাপিতেই কাজ হয়েছিল। মাস কয়েক পরে ডাঃ রাঘব বক্সীর চেম্বার থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখন আর গজাননকে চেনা যায় না। বাবরি প্যাটার্নের অসুর মার্কা চুল ওর বরাবরই। কিন্তু শরীর আরও মজবুত হয়েছে। গায়ের রং আগে ছিল ফরসা, এবং লালচে। চোখ-মুখ-নাকের ধার আরও বেড়েছে। সব মিলিয়ে ঝকঝক করছে চেহারাটা।

ডাঃ বক্সী তাকে পিটিয়ে শক্ত করে দিয়েছেন। লোহা থেকে ইস্পাত। আসবার সময়ে চোখে চোখ রেখে কঠোর কাটা কাটা স্বরে শুধু বলেছিলেন, গজানন, আর যাই করো, কুপথে যেও না, তোমার মধ্যে যে সম্পদ আছে, তা দেশের কাজে লাগিও।

তাই স্পাই কোম্পানি খুলে বসেছিল গজানন ওরফে ট্রিপল-জি ওরফে জিরো জিরো গজানন।

উদ্দেশ্য একটাই, দুর্নীতির অবসান। কালোবাজারি হটাও, দেশকে বাঁচাও–এই হচ্ছে জিরো জিরো গজানন কোম্পানির পলিসি।

বেপারিটোলা লেনের অফিস থেকে বেরিয়ে একদিন হিন্দ সিনেমার সামনে ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে দেখেছিল কলগার্ল পুঁতিবালাকে। দেখেই বুঝেছিল, এমন মেয়েকেই তার দরকার সাগরেদ হিসেবে। ন্যাতাজোবরা মেয়েদের দিয়ে এ লাইনে কিছু হবে না। চাই শার্প, ডেয়ারিং, বডি অ্যাফেয়ার্স নিয়ে সনাতনী ধারণাহীন বলগা ছাড়া মেয়ে। যার তেরচা চাহনি, বুকের ইশারা আর নিতম্বের দুলুনি দেখে পার্টি মজবে, পথ পরিষ্কার হবে দরকার হলে বডিলাভেও পার্টিকে ঘায়েল করবে–মনে কিন্তু দাগ পড়বে না। ইমোশন-টিমোশন নিয়ে এ কারবার চলে না। টিট ফর ট্যাট।

পুঁতিবালাকে অফিসে নিয়ে এসেছিল গজানন। তিনকুলে কেউ নেই শুনে, বউবাজারের হাড়কাটা গলির ডেরা তুলে দিয়ে ঠাই দিয়েছিল অফিস ঘরেরই পাশের ঘরে। পুঁতিবালার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল শার্দুল-চরিত্র ট্রিপল-জি।

ট্রেনিং? বেলেঘাটার রাস্তার ধারে বসে আর পাড়ায়-পাড়ায় মস্তানি করে যে ট্রেনিং পেয়েছে গজানন, তা কম কী? যে-কোনও টেররিস্ট বর্তে যাবে এই জাতীয় কলকাত্তাই ট্রেনিং পেলে। কথায় বলে যা নেই কলকাতায় তা নেই.....

যাক সে কথা। গজানন কোম্পানি দু-বছরেই গাড়ি কিনে ফেলেছে। অফিস চেম্বারটিকেও মডার্ন করে ফেলেছে। এই কলকাতারই বেশ কয়েকটা বড় কোম্পানি তাকে দিয়ে অনেক কালো কারবার ধরে ফেলেছে। লোকসান কমতেই কোম্পানির লাভের অঙ্ক

বেড়েছে। গজাননের কোনও নির্দিষ্ট দক্ষিণা নেই। যত লোকসান বাঁচিয়ে দেবে তার ফাইভ পারসেন্ট দিতে হবে।

তাতেই এই অবস্থা। যার জীবনের ভয় নেই, রাতদুপুরেও যে খিদিরপুর ডকে গিয়ে বিদেশি মাল চুরি হচ্ছে দেখে, লুকিয়ে থেকে, বিদেশি জাহাজ থেকে নৌকোয় আউটরাম ঘাটে প্যাকেটে দামি বস্তু হস্তান্তরের সময়ে সাহেব পার্টিকেও খপাত করে চেপে ধরতে দ্বিধা করে না–এমন ডাকাবুকো মূর্তিমান যমকেই তো চায় বড়-বড় কোম্পানিরা।

বর্তমান কাহিনির শুরু বেশ কিছুদিন আগে। এয়ারকন্ডিশনড ঘরে বসে নস্যিও নিচ্ছে, পাইপও খাচ্ছে গ্রেট গজানন। পুঁতিবালা বেরিয়েছে একটা ধুরন্ধর অ-বাঙালি স্মাগলারের পেট থেকে কথা বার করতে। তৈরি হয়েই বেরিয়েছে। হয়তো রাত্রে নাও ফিরতে পারে। বেশ আছে চুড়ি। মজাও লুটছে, কাজও করছে। গজানন অবশ্য এই সময়গুলোয় বেশ উদ্বেগের মধ্যেই থাকে পুঁতিবালার জন্যে। হাজার হোক মেয়েছেলে তো। গজানন ওকে দেখে নিজের বোনের মতো। তাই....

এমন সময়ে বাজল টেলিফোন। লাল টকটকে রিসিভার তুলে নিল গজানন। তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল সুমিষ্ট নারীকণ্ঠ জিরো জিরো গজানন?

বলছি।

একটু ধরুন।

সেকেন্ড কয়েক পরেই ভারি গলা ভেসে এল তারের মধ্যে দিয়ে।

মিঃ ট্রিপল জি, আমি ত্রিশূল বলছি। একটু থেমে–চিনতে পারছেন?

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ সঙ্ঘ?

রাইট, মিঃ ট্রিপল-জি আপনার সাহায্য দরকার।

আমি তো পিঁপড়ে আপনাদের কাছে। টিপে মেরে ফেললেই পারেন।

আরে ছিঃ ছিঃ। উদ্দেশ্য আমাদের একই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যাক, টেলিফোন ট্যাপিং হতে পারে।

হয়ে গেল বোধ হয় এতক্ষণে।

পাবলিক টেলিফোন থেকে কথা বলছি ওই কারণেই। আমাদের প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস জানেন?

অতবার ঠিকানা পালটালে জানব কী করে?

নোট ডাউন। থ্রি লেটার্স–সিক্স--টোটাল লাইন। মাইনাস থ্রি। ফাইন্যাল সিক্স। সুপ্রভাত।

লাইন কেটে গেল।

সুপ্রভাত দৈনিকটা সামনেই পড়ে। সুপ্রভাত বলে শুভেচ্ছা জানানো হল না গজাননকে, সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি ওর ব্রেনে আছে। কোড মেসেজে বলা হল সুপ্রভাত কাগজটা দেখতে দেখতে হবে সম্পাদকীয় পাতা। এইটাই নিয়ম। সম্পাদকীয় বার করে প্রথম প্যারাগ্রাফের প্রতি ষষ্ঠ শব্দ বেছে নিয়ে কাগজে লিখল গজানন। লেখাটা দাঁড়াল এই :।

দিলদার ভবন। অরুণাভ। পঁয়ত্রিশ।

পাইপ নিভে গেছে। নস্যির ডিবে পেঁচিয়ে খুলতে খুলতে হাতঘড়ি দেখে নিল গজানন। ঠিক পনেরো মিনিটেই পৌঁছে যাবে দিলদার ভবনের পঁয়ত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে অরুণাভর কাছে।

.

যন্ত্রদানবের সামনে

অরুণাভ লোকটা যে এত কালো আর বেঁটে, এত মোটা আর কদাকার হবে, গজানন ভাবতেই পারেনি।

কালো জুনোয় কালো পালিশ লাগিয়ে বুরুশ দিয়ে ঘষলে যা দাঁড়ায়, শ্রী অরুণাভর মুখের কান্তি সেই রকম। তার ওপর মাথাজোড়া টাক। গদিমোড়া কালো রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই চেয়ার বেচারি যেন স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে পিঠঠাকে একটু সিধে করল। মোটা বটে। কী খায়? এত চর্বি আসে কোত্থেকে?

বলুন গজাননবাবু, কালো মুখে সাদা দাঁত বার করে ভারি অমায়িক হাসি হাসল অরুণাভ। ওই হাসি আর কথাগুলোর মধ্যে দিয়েই প্রকট হল লোকটার ভেতরে সচল রয়েছে বুঝি একটা ডায়নামো। শক্তির ডায়নামো। ঝকঝকে কিন্তু ছোট-ছোট দুই চোখে যেন তারই স্পার্ক।

সতর্ক হল গজানন। বেলেঘাটার রাস্তা থেকে আজ সে উঠেছে যেখানে, এই ত্রিশূল সঙ্ঘ কিন্তু সেখান থেকে অনেক উঁচুতে। পৃথিবী জুড়ে জাল পেতে খপাখপ ধরছে রাঘববোয়ালদের। তার মতো চুনোপুটিকে কী দরকারে তলব পড়ল, ঠিক ভেবে ওঠা যাচ্ছে না। খতম-টতম করে দেবে না তো? সিক্রেট এজেন্টদের পক্ষে সবই সম্ভব। এই লাইনে প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ রাখতে চায় না।

বসল গজানন। একটু ঝুঁকেই বসল। যাতে বাঁ-দিকের কোমরে হোলস্টারটা টেবিলে ঠেকে যায়। বুশ শার্টের তলায় থেকেও খাপে গোঁজা নাইন এম এম লুগারটা অনেকটা ধাতস্থ করে তোলে ট্রিপল জিকে। শক্তির আধার তারও হাতের কাছে। এক থেকে তিন গুনতে যেটুকু সময় লাগে, তার মধ্যেই লুগার চলে আসবে হাতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে চক্ষের নিমেষে।

চোখে-চোখে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিল অরুণাভ। যেন গজাননের মনের কথা টের পেয়েছিল। ড্রয়ার টেনে একটা চকচকে উইলহেলমিনা বার করে রাখল সাড়ে পাঁচ মিলিমিটার পুরু কাঁচ দিয়ে ঢাকা টেবিলের ওপর।

বলল, আপনারটাও এখানে রাখতে পারেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে নাইন এম এম লুগার বের করে উইলহেলমিনা-র পাশে রেখেছিল গজানন। দুটো আগ্নেয়াস্ত্রই প্রায় একই রকম দেখতে। দুটোই প্রাণ-প্রদীপ নিভিয়ে দিতে মোক্ষম।

এবার কাজের কথায় আসা যাক, বলেছিল অরুণাভ আপনি রিসেন্ট সুইসাইড কেসগুলো নিয়ে ভেবেছেন?

কাজের লোক বটে এই অরুণাভ। এক্কেবারে আসল পয়েন্টে চলে এসেছে। মাস দুয়েকের মধ্যে তিনটে সুইসাইডের রহস্য গজাননের মগজেও আলোড়ন তুলেছে। এদের মধ্যে একজন ছিল তারই পার্টি। হরেন জোয়ারদার। কোটিপতি। উলটোডাঙায় গেঞ্জির কল আছে। মিজোরামে নিজের জমিতে ঔষধি গাছের চাষবাসও করত। মিজোরামের হার্বস এক্সপোর্ট করে যখন কোটিপতি, ঠিক তখন ভদ্রলোক দ্বারস্থ হয়েছিল গজাননের। কারা যেন তাকে সমানে হুমকি দিয়ে চলেছে টেলিফোনে আর চিঠিতে। ওখানে অত টাকা রাখো, এখানে এত টাকা রাখোনইলে বোমা মেরে দেব খুলি উড়িয়ে।

গজানন নেমে পড়েছিল মাঠে। নেমে, কাজটা টেক-আপ করেই ধড়াধড় এগিয়ে গেছিল বেশ খানিকটা। হাতেনাতে ধরেও ফেলেছিল হুমকি দেনেওলাকে। হ্যাঁ, একজনই। জোয়ারদারের গেঞ্জির কলের ইউনিয়ন লিডার।

সে কেস মেটবার মাসখানেক পরেই একটা টেলিফোন এল গজাননের কাছে। ফোন করছে জোয়ারদার স্বয়ং।

গজাননবাবু? ভারী বিমর্ষ স্বর–এসব কী হচ্ছে?

কী হচ্ছে মানে? ঘাবড়ে গেছিল গজানন। অন্যায়-টন্যায় করে ফেলল না কি? ডাঃ বক্সীর কাটা-কাটা কথা এখনও কানে লেগে রয়েছে–অন্যায় পথে যেও না। জ্ঞাতসারে তো যায়নি গজানন। তবে?

জোয়ারদারের বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর হঠাৎ বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে–ওই...ওই শুনুন আবার ওরা শাসাচ্ছে ...।

কারা? কারা? কারা? চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে গজানন–কোন শয়তানের বাচ্চারা?

ওই তো–ওই তো দলে-দলে দরজা দিয়ে ঢুকছে আর জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাকে ডাকছে, গজাননবাবু, আমাকে ডাকছে, বলছে–শান্তি, শান্তি, এই পথেই শান্তি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তার শান্তি এইখানে, এই জানলার বাইরে। গজাননবাবু, ও গজাননবাবু বেরিয়ে যাব জানলা দিয়ে?

না, না, না, এমন জোরে সেদিন গজানন চেঁচিয়েছিল যে তিনদিন ভোকাল কর্ড ভালো কাজ দেয়নি–ভাঙা গলায় কথা বলতে হয়েছে–চোদ্দোতলার জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন কী? আপনার মাথা কি খারাপ হয়েছে?

আমার মাথা খারাপ? হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! আমার মাথা খারাপ বলার আগে গজাননবাবু আপনার মাথাটা মনের ডাক্তার দিয়ে দেখিয়ে নিন। ওই ওই ওই কটমট করে আবার তাকাচ্ছে, শাসাচ্ছে–বলছে, চলে আয় চলে আয় চলে আয়–ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়! যাই গজাননবাবু, এত করে ডাকছে।

দড়াম করে টেলিফোন আছড়ে পড়ার শব্দ ভেসে এসেছিল। মনশ্চক্ষে গজানন দেখতে পেয়েছিল, টেলিফোন ক্রেডল-এ রিসিভার বসানো হয়নি। ঝুলছে। তাই শোনা যাচ্ছে জোয়ারদারের জোরাল গলায় অট্টহাসি দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে। তারপরেই–নৈঃশব্দ্য!

মনের চোখে বাকি দৃশ্যটুকুও কল্পনা করে শিউরে উঠেছিল গজানন। ধাঁই করে রিসিভার নামিয়ে রেখে ধড়মড় করে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। উল্কাবেগে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের চোদ্দোতলা বাড়িটার সামনে পৌঁছেই দেখেছিল কাতারে কাতারে লোক জমে রয়েছে রাস্তা পর্যন্ত।

জোয়ারদার তার কথা রেখেছিল। এই বহুতল অট্টালিকার কোনও ঘরেই জানলায় গরাদ নেই। জানলায় বাইরে তাই পাটাতন পেতে ফুলের টব রাখা হয়। এই রকমই জানলা গলে হাসতে হাসতে শূন্যে লাফ দিয়ে–আছড়ে পড়েছে একতলায়।

থ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল গজানন। আচমকা শক খেয়েই স্থাণু হয়ে গেছিল। মস্তিষ্ক একদম কাজ করেনি।

তারপরেই বিদ্যুৎ খেলে গেছিল কোষে-কোষে। জোয়ারদারকে কি ভূতে পেয়েছিল? নাকি পাগল হয়ে গেছিল? মনের ডাক্তারকে দিয়ে গজাননের মাথাটা দেখাতে বলছিল। ভদ্রলোকের জানা ছিল না, ও কাজটি সেরেই এ লাইনে এসেছে গজানন। তাহলে, তাহলে

দি আইডিয়া। মনের ডাক্তারের কাছেই ছোটা যাক।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থেকে বাঁই-বাই করে গাড়ি চালিয়ে একেবারে ইন্দ্র দত্ত রোড এক কোণে ডাঃ বক্সীর কেয়ার ক্লিনিক। লোহার গেটের ভেতরে চাবি হাতে বসেছিল নেপালি দারোয়ান। গজাননকে দেখেই একগাল হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল?

–কী খবর?

ডাক্তারবাবু–ডাক্তারবাবু আছেন?

গজাননের মুখের চেহারা আর কথার ধরন দেখে হাসি মিলিয়ে গেছিল দারোয়ানের মুখ থেকে। কেস গড়বড় মনে হচ্ছে? অনেকেই এরকম ফিরে আসে বটে। কিন্তু এভাবে নিজে থেকে–

তাড়াতাড়ি তালা খুলে গজাননকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল দারোয়ান।

–বসুন, খবর দিই।

একটু পরেই ডাক এসেছিল ওপর থেকে। বাইরের ঘরে গদিমোড়া চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিলেন দীর্ঘদেহী অতীব সুপুরষ ডাঃ বক্সী। ফরসা দুই চোখে যেন ঈগলের চাহনি।

কী ব্যাপার, গজানন?

ব্যাপার কী তা ব্যক্ত করেছিল গজানন। শুনেটুনে হা-হা করে হেসে ডাঃ বক্সী বলেছিলেন– না, না ভূত নয়, প্রেত নয়, দত্যি নয়, দানো নয়, পিশাচ নয়–কিসসু নয়। গজানন, ব্যাপারটা তোমার বোঝা উচিত ছিল।

কী, স্যার?

অডিটরি হ্যাঁলিউসিনেশন। অপটিক্যাল হ্যাঁলিউসেনশন। কর্ণ বিভ্রম আর দৃষ্টি বিভ্রম। এরকম কেস তো এখানেই ছিল–তুমি যখন ছিলে। এখনও আছে। মনে হয় যেন দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত অবিরাম শুনে যাচ্ছে। অথবা চোখের সামনে সায়রা বানুকে দেখতে পাচ্ছে। ইডিয়ট!

অরুণাভ চেয়েছিল গজাননের দিকে। দুই চোখে সেই স্পার্ক। এখন বললে–বুঝতে পারছেন কেন আপনাকে ডাকা হয়েছে? আপনারই একজন ক্লায়েন্ট পাগল হয়ে গিয়ে

আত্মহত্যা করেছে। ঠিক একইভাবে পাগল হয়ে গিয়ে একজন চলন্ত লরির সামনে লাফিয়ে পড়েছে হাসতে-হাসতে।

আর একজন হাওড়ার পোল থেকে। গজাননবাবু, এই দুজনেই ছিল আমাদের ক্লায়েন্ট।

অ্যাঁ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। কুচক্রীদের হাত থেকে বাঁচতে এই তিনজনেই শরণ নিয়েছিল আমাদের। এই ঘটনা পরপর ঘটে যেতে থাকলে কেউ আর আমাদের কাছে আসবে না। কুচক্রীদের কারবার ফলাও চলবে। আপনি কি তাই চান?

কক্ষনও না।

তাহলে শুনুন এখনও যা জানেন না। জোয়ারদার আপনার মক্কেল ছিল–কারেক্ট?

সব খবরই তো রাখেন।

একটু বেশিই রাখি। জোয়ারদার কিছুদিন নিউইয়র্কে ছিল জানেন?

জানি। বেড়াতে গেছিল।

আজ্ঞে না। কারবার করতে গেছিল। কুল ড্রিঙ্কস-এর নাম শুনেছেন?

নিশ্চয়।

দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে পৃথিবী বিখ্যাত এই কোম্পানি আবার ইন্ডিয়ায় ব্যবসা করার জন্যে লাইসেন্স চেয়েছে। এখন ইন্ডিয়ায় সফট ড্রিঙ্কস এর যা টোটাল মার্কেটতার সবটুকু মিটোনোর মতো প্ল্যান্ট ক্যাপাসিটি চেয়ে দরখাস্ত করেছে। অথচ ইন্ডিয়ায় এই টোটাল মার্কেটটা ধরে রেখেছে। তিনটে কোম্পানি। তাদের নাম বলার দরকার আছে কি?

না। বলে যান।

বলে গেল অরুণাভ, এই তিনটে কোম্পানির তিন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যাপ্রোচ করেছে গভর্নমেন্টকে, লাইসেন্স যেন ইস্যু করা না হয়। পেল্লায় আমেরিকান কোম্পানির দাপটে ধুলোয় মিশে যাবে তিন-তিনটে ইন্ডিয়ান কোম্পানি। ক্লিয়ার?

ও ইয়েস, তারপর? নস্যি নিল গজানন।

নস্যির ডিবের দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে চেয়ে অরুণাভ বললে, আমাকেও দিন।

খুশি হল গজানন। নস্যি কালচার সিক্রেট এজেন্ট মহলেও তাহলে ঢুকে পড়েছে! গুড! বাড়িয়ে দিল ডিবেটা-তারপর?

তারপর-এর কথাটা নস্যি নেওয়ার পরে বলল অরুণাভ। এই তিন জনের দুজন সুইসাইড করেছে। কাগজে ছবিও বেরিয়েছে।

কিন্তু জোয়ারদার তো এসবের মধ্যে ছিল না।

মশায় গজানন, আই মীন, মাই ডিয়ার গজাননবাবু, হার্বস বেচতে জোয়ারদার নিউইয়র্কে গেছিল ঠিকই, কিন্তু তাকে মোটা রকমের শেয়ার অফার করা হয়েছিল কুল ড্রিঙ্কস-এর তরফ থেকে যাতে ইন্ডিয়ায় জবর ঘাঁটি গড়ে তোলা যায়। জোয়ারদারের আসল জোর কোথায় ছিল জানেন তো?

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে।

রাইট। জোয়ারদার অফার অ্যাকসেপ্ট করেনি। তিন-তিনটে ইন্ডিয়ান কোম্পানির সর্বনাশ করতে চায়নি, এই তার অপরাধ।

কিন্তু জোয়ারদার তো পাগল হয়ে গেছিল।

বেঁটে মোটা কালো শরীরখানা দুলিয়ে-দুলিয়ে কিছুক্ষণ ধরে অট্টহাসি হাসল অরুণাভ। হাসির মধ্যেও যেন ব্যাটারির চার্জ।

বললে, ইন্ডিয়ায় পয়লা সারির বিজনেস ম্যাগনেটগুলো হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করছে, মনে একটুও ধন্দ লাগছে না?

তা ইয়ে...খটকা একটু লাগছে বইকী।

সফট ড্রিঙ্কস ম্যানুফাঁকচারারদের তিন ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের মধ্যে বাকি আছে একজন, রাম সিং। এই মুহূর্তে দার্জিলিংয়ে।

আই সী।

ইয়েস, নাউ ইউ সী। হাসল অরুণাভ। যেন কালো মেঘের মধ্যে থেকে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ। এই রাম সিংকে প্রোটেকশন দিতে হবে আপনাকে। তক্কে-তকে থাকলে মিস্ট্রিটা সলভ করে ফেলতেও পারেন।

বাট, বাট আপনাদের এত বড় সংগঠনের কাউকে না পাঠিয়ে হোয়াই আমাকে...

বিকজ আপনার একজন ক্লায়েন্টের মুখ চিরকালের মতো বন্ধ করা হয়েছে বলে। বিকজ আরও অনেকের মুখ এভাবে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলে। বিকজ আপনাকে কাউন্টার স্পাই হিসেবে লাগাতে চাই বলে।

কাকাউন্টার স্পাই!

ইয়েস মাই ডিয়ার মিস্টার গজানন। ত্রিশূল সংগঠনের কেউ ওখানে নেই, একবারও কি আপনাকে তা বলেছি? বলিনি। তা সত্ত্বেও আপনাকে পাঠাতে চাই–ডবল এজেন্ট হিসেবে। আপনি তার ওপরেও নজর রাখবেন রাম সিংকেও দেখবেন। হাসল অরুণাভ লাইনটা খারাপ জানেন তো। টাকার টোপ বড় সাংঘাতিক জিনিস। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমাদের রিপোর্ট অন্যরকম। আপনি জান দেবেন, তবু মান দেবেন না।

থ্যাংক ইউ ফর দ্য কমপ্লিমেন্টস, ডাঃ বক্সীর কাছে শেখা উচ্চারণে চোস্ত ইংরেজিটা ঝেড়ে দিল গজানন। এ রকম গোটা বারো বাঁধা গৎ তার মুখস্থ। বিজনেস চালাতে গেলে একটু দরকার বইকী।

বললে–ত্রিশূল এজেন্টের নাম?

চেহারাটাই দেখিয়ে দিচ্ছি। চিনতে সুবিধে হবে, বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল অরুণাভ। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে লাগানো ছোট ড্রয়ার ক্যাবিনেটের ওপরের ড্রয়ারটা খুলল চাবি

ঘুরিয়ে। ভেতর থেকে বার করল ছোট্ট একটা রূপোর কার্ড। কমপিউটার কার্ড যেভাবে পাঞ্চ করা থাকে, রূপোর এই কার্ডও সেইভাবে পাঞ্চ করা। কার্ডটা হাতে নিয়ে গেল পেছনের দেওয়ালে লাগানো ফাইলিং ক্যাবিনেটের সামনে। রূপোর কার্ডটা ঢুকিয়ে দিলে ক্যাবিনেটের গায়ে সরু ফোকর দিয়ে। কালো ইস্পাত ক্যাবিনেট মসৃণগতিতে সরে গেল একপাশে দেখা গেল দেওয়ালের ভেতরে বসানো চৌকো স্টিল সিন্দুক।

গজাননের চোখ তখন ছানাবড়া সিন্দুকের ঠিক মাথার লেন্সটা দেখে। শরীরের প্রতিটি পেশি টান-টান হয়ে উঠেছে আপনা থেকেই। এ দৃশ্য সে আগেও দেখেছে এবং দেখেছে বলেই প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে টেনে লম্বা দেওয়ার। ত্রিশূল সঙেঘর টপ-সিক্রেট ডকুমেন্টস আছে এই সিন্দুকে। সেই সঙ্গে আছে বিস্তর বিস্ফোরক। শুধু এই ঘরখানা কেন, পুরো বাড়িটাকে পাউডার করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ত্রিশূল সঙেঘর প্রতিষ্ঠাতারা ভারতের বড় বড় সংস্থার মালিক। সারা পৃথিবীতে ছাড়ানো ব্যবসার জাল। দুর্নীতিচক্র রোধ করার জন্যে নিজেদের স্বার্থে বেসরকারি এই সিক্রেট-এজেন্ট অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানী করে আশ্চর্য কৌশলে।

ত্রিশূল তাই একটা বিভীষিকা-ভারত-শত্রুদের কাছেও।

সিন্দুকের পাশে একটা লিভারে অরুণাভ চাপ দিতেই আচমকা ফ্ল্যাশে চোখ ধাঁধিয়ে গেল গজাননের। পিলে চমকে উঠলেও স্বস্তি পেল প্রাণটা এখনও যায়নি দেখে। সিন্দুকের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা অরুণাভর ফটো তুলে নিল লেন্স। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল

গজানন তফাতে। দাঁড়িয়ে আছে। অরুণাভও। লেন্স তার কাজ করে চলেছে। কমপিউটারের মেমারি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অরুণাভর ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। দাঁড়িয়ে থাকা অরুণাভর ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। দাঁড়িয়ে থাকা অরুণাভর শরীরের প্রতিটি লাইনের সঙ্গে ফটোর অরুণাভর প্রতিটি লাইন মিলে যাওয়া চাই। না মিললেই অনর্থ ঘটবে। কমপিউটারের সঙ্গে সরাসরি লাগানো রয়েছে ডিটোনেটর যন্ত্রপাতি বিস্ফোরণ ঘটবে এক্ষুনি।

এত আধুনিকতা ভালো নয়, মনে-মনেই বলে গজানন। আরে বাপু, অরুণাভর একটা চুলও যদি পেকে গিয়ে থাকে এবং সেই পাকা চুলের চিহ্ন যদি ফটোতে না পাওয়া যায়, বেআক্কেলে যন্ত্রদানব বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসবে এখুনি। অথবা যদি তাড়াহুড়োয় দাড়ি কামাতে ভুলে যায়, তাহলেও রক্ষে নেই।

তাই ভেতরে-ভেতরে ঘেমে ওঠে গজানন দ্য গ্রেট।

কিন্তু সন্তুষ্ট হয়েছে কমপিউটার। নিঃশব্দে খুলে গেল সিন্দুকের পাল্লা। ভেতর থেকে একটা ফাইল বার করে আবার লেন্সের সামনে দাঁড়াল অরুণাভ। চাপ দিল লিভারে। আবার দেখা গেল ফ্ল্যাশ। বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। ফাইলিং ক্যাবিনেট পিছলে এল সিন্দুকের সামনে।

চেয়ারে এসে বসল অরুণাভ। ফাইল খুলে মেলে ধরল গজাননের সামনে।

ভারি মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ের দিকে অপলকে চেয়ে রইল ট্রিপল জি। পরনে টাইট জিনস প্যান্ট। হাফ হাতা ঢিলে শার্ট। গলায় একটা লকেট। ছোট করে ছাঁটা চুল। অনেকটা ছেলে ছেলে চেহারা হলেও মুখের লাবণ্যের জন্যে বোঝা যায় মেয়ে। ঠোঁট দুটো কিন্তু পুরু এবং শক্ত। ওই ঠোঁট আর বেশবাস দেখে গজাননের ধারণা হয়ে গেল, এ মেয়ে লবঙ্গলতিকা নয় মোটে– রীতিমতো ব্যায়াম বীরাঙ্গনা।

সে অভিজ্ঞতাও হয়েছিল যথাসময়ে।

বললে চোখ তুলে–চিনে নিলাম। কিন্তু সে আমাকে চিনবে কী করে?

আপনার চেহারার ডেসক্রিপসন একটু পরেই ওয়্যারলেসে চলে যাবে।

নাম?

অনিমা।

বাঙালি?

অবাক হচ্ছেন কেন? আপনার সাগরেদ পুঁতিবালাও তো বাঙালি।

তা ঠিক। তবে আপনাদের তথ্যের একটু ভুল আছে। পুঁতিবালা নামটা যাচ্ছেতাই বলে ওর একটা বেটার নেম আমি দিয়েছি।

প্রীতিবল।

মাই গড! চোখ কপালে তুলে ফেলে গজানন–তাও জানেন? হাসল অরুণাভ। সেই ব্যাটারি চার্জড় শক্তিমানের হাসি।

বললে, কত নেবেন?

কত দেবেন?

এখন বিশ হাজার। ক্যাশ। অন্য খরচ আমাদের।

কাজ শেষ হলে?

কাজের শেষটা কী হয় দেখা যাক, আবার সেই ব্যাটারি চার্জড হাসি। এবারে রীতিমতো নিগূঢ়। অর্থাৎ বেঁচে ফিরে আসো কিনা দেখি? এক লাখেও পৌঁছতে পারে।

খুব কম।

ডোন্ট বারগেন, একটু কর্কশ শোনায় অরুণাভর স্বর। চোয়ালও কঠিন। চোখের স্পার্ক দ্বিগুণ ত্রিশূলের একটা কাজ করলেই সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে বসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

জানি, হাসল গজাননও। বেলেঘাটাই হাসি বাজিয়ে নিলাম। ডোন্ট মাইন্ড।

.

বাঘের গুহায়

কিন্তু বাঁচানো গেল না রামসিংকে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পুঁতিবালা ওরফে প্রীতিল যে খবর দিল তা সাংঘাতিক।

লাশ দেখে আর লাভ কী? বিশ হাজার নগদ নিয়ে ত্রিশূলের পয়সায় দার্জিলিং-এর মতো জায়গায় এত লপচপানি করে শেষে এই হল? অরুণাভ যা টেটিয়া লোক, এবার জানে না মেরে দেয়।

মুখের ভেতরটা বেশ গরম-গরম লাগছে। আমেরিকান ট্যাবলেটের কারবারই আলাদা। মাথার ভেতরকার ভোঁ-ভোঁ ভাবটাও একটু কেটেছে। মনে-মনে ডাঃ বক্সীকে স্মরণ করল গজানন। লোকটা নির্ঘাত দেবতা। আপদে-বিপদে অলক্ষিতে এমন বাঁচিয়ে দেয়। এই ট্যাবলেট যদি সঙ্গে না থাকত, মেন্টাল শকেই আবার মেন্টাল হোমে দিন কাটাতে হত।

মেজাজ খিঁচড়ে গেলে গ্রেট গজানন পুঁতিবালার ওপরেই ঝাল ঝাড়ে। পুঁতিবালা যদিও এখন আর সেই পুঁতিবালা নেই। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছিল বলে শরীরেও গ্লানি জমা হয়েছিল। এখন তার চেহারা ঝকঝকে, চোখ চকচকে, রং টকটকে। তবুও গজাননের কাছে আগুনের শিখা এই প্রীতিবল-নুয়ে পড়ে আগেকার পুঁতিবালার মতোনই।

তেড়ে বললে গজানন, তোকে যে বলেছিলাম, রাম সিং-এর সঙ্গে ফ্লার্ট করতে। করেছিলি?

মুচকি হেসে পুঁতিবালা বললে, তা আর করিনি। মনে রং ধরিয়ে তবে ছেড়েছি।

তবে মরতে গেল কেন?

পাগল হয়ে যাচ্ছিল যে।

হয়ে যাচ্ছিল! চোখ বড় হয়ে যায় গজাননের।–এতদিন বলিসনি কেন?

মুখের সামনে দু-হাত ঘুরিয়ে বুড়ি খুকির মতো বললে পুঁতিবালা কখন বলব গো? যখনই অমি একা হই, তখনই দেখি তুমি দোকা।

শাট আপ।

ফিক করে হেসে ফেলে পুঁতিবালা–বেড়ে মেয়েটা, না দাদা? বিয়েই করে ফ্যালো না।

আমাদের লাইনে কেউ বিয়ে করে না। করলেই ফাঁস–গলায় ছুরির কোপ দেখানোর ভঙ্গিমা দেখিয়ে।অথবা দুম! রগে পিস্তল ছোঁড়ার অভিনয় করে।–তোকেই বলছি, বিয়ে ফিয়ের কথা মনেও আনবি না। বুঝেছিস?

দাদা গো দাদা, তা আর বুঝিনি। হাড়ে হাড়ে বুঝছি। কিন্তু দাদা, প্রথম দিন যেদিন ম্যালে গিয়ে ঘোড়া নিলে। অনিমা বউদি–।

বউদি!

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। অনিমাদির ঘোড়ায় চড়াটা লাভলি, তাই না?

গেছো মেয়ে নাম্বার ওয়ান।

গোছো মেয়েই আমার ভাল্লাগে, মুখ গোল করে বললে পুঁতিবালা–তা দুটিতে জলাপাহাড়ে গিয়ে কী করলে গো?

গেট আউট!

পুঁতিবালা তো গেট-আউট হলই না, উলটে আরও বেশি ইন হয়ে গেল। অর্থাৎ সোফায় ঝপ করে শুয়ে পড়ে পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে লাগল। আড়চোখে কিন্তু তাকিয়ে রইল গজাননের দিকে।

গজাননের মাথায় তখন চিন্তার তুফান। প্রথম দিনেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট মতো ম্যালেতে চিনে ফেলেছিল অনিমাকে। ঘোড়ায় চড়ে জলাপাহাড়ে যেতে-যেতে কথাও হয়েছে। ঠিক হয়েছে গোপনে দেখাশুনো হবে বোটানিক্যাল গার্ডেনে, দিনের আলোয়, গাছপালার আড়ালে। প্রতিদিনই দুপুর দুটোর সময়ে একবার দেখা হবেই।

তা দুদিন দেখা হয়েছে বইকী। জানা গেছে অনেক কথা। গজানন আর পুঁতিবালা টুরিস্টের ভিড়ে এখনও মিশে আছে বলে রক্ষে, কিন্তু বেশিদিন থাকলেই সজাগ হবে অদৃশ্য চক্ষুরা। অনিমার সে ভয় নেই। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সে। থাকে লেডিজ হোস্টেলে। প্রতি সন্ধ্যায় যায় ভিডিও গেমের জুয়োর আসরে। এবং ওইখানেই রয়েছে সন্দেহজনক কিছু লোকের আনাগোনা।

ভাবতে-ভাবতেই মতলব স্থির হয়ে যায় গজাননের। প্রাণ নিয়ে টানাটানির গেম-এ নেমে প্রাণটাকেই পণ করে এবার খেলায় নামা যাক। মরতে ভয় পায় না গজানন। কিন্তু কোন...বাচ্চারা রাম সিং এবং আরও তিনজনকে পাগল বানিয়ে আত্মহত্যা করাচ্ছে, কীভাবে পাগল বানাচ্ছে, তা ্না জানলে গজানন নিজেই তো ফের পাগল হয়ে যাবে। তার চাইতে বাঘের গুহাতেই ঢোকা যাক। যা থাকে কপালে।

পুঁতিবালা, আই মীন, প্রতিবল–গম্ভীর স্বর গজাননের। দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছে। সঙ্কল্পে পৌঁছেছে। গলার স্বর পালটে গেছে।

বুঝল পুঁতিবালাও। গজাননকে সে চিনে ফেলেছে। অসম্ভব ডেয়ারিং। আর অসম্ভব গোঁয়ার। গজানন নিজেও বলেছিল একদিন, ওর নাকি অবসেসন্যাল পার্সোনালিটি আছে। যা ধরবে, তা করে তবে ছাড়বে। পুঁতিবালা বলেছিল, শুয়োরের গোঁ বললেই হয়। খেপে গেছিল গজানন।

কিন্তু আজকে আর টিটকিরি দেওয়ার সাহস হল না পুঁতিবালার। গ্রেট গজাননের মুখ থমথম করছে। ভুরু কুঁচকে গেছে। চোখ আর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। বেলেঘাট্টাই গজানন জাগছে ট্রিপল জি-এর মধ্যে।

বলো দাদা–মিনমিনে গলায় বললে পুঁতিবালা।

রিভলভারটা দে।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল পুঁতিবালা। সুবোধ বালিকার মতো বালিশের তলা থেকে হোলস্টার সমেত রিভলভার এনে দাঁড়াল গজাননের সামনে। গজানন ততক্ষণে বুশশার্ট খুলে ফেলেছে। দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নিপুণ হাতে কাঁধে আর বগলের তলা দিয়ে চামড়ার বেল্ট বেঁধে আগ্নেয়াস্ত্র ঝুলিয়ে দিল পুঁতিবালা। হাত নামিয়ে বুশশার্ট পরে নিল গজানন। ঘড়ি দেখল। দুপুর একটা।

বলল–দুটোর সময়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে দেখা হবে অনিমার সঙ্গে। সন্ধ্যায় যাব ভিডিও গেমের আড্ডায়। খুঁচিয়ে ঘা করে ধরা দেব। নিয়ে যাক ওদের ঘাঁটিতে। তারপর এসপার কি ওসপার। দাঁত কিড়মিড় করে গজানন শালা-বাচ্চা! দেখি তোদের কত মুরোদ।

গজাননের চেহারা এক্কেবারে পালটে গেছে। প্রমাদ গণে পুঁতিবালা। গান ডুয়েলের জন্যে তৈরি হয়েই বেরোচ্ছে গজানন। রক্ত ঝরাবে। নিজেও মরতে পারে। তারপর?

আমার কী হবে? ককিয়ে ওঠে পুঁতিবালা।

শাট আপ! সন্ধ্যার পর নজর রাখবি ভিডিও গেমের আড্ডায়। ভেতরে ঢুকবি না। খবরদার! আমাকে নিয়ে গেলে পেছন নিবি না। চোপরাও। কোনও কথা না। কাল

সকালে না ফিরলে পুলিশে খবর দিবি। নিজে থেকে ওস্তাদি মারতে যেও না, বুঝেছ? গেছো মেয়ে অনিমা থাকছে সঙ্গে, ভয় কী? সস্নেহে পুঁতিবালার মাথা চাপড়ে দেয় গজানন, এ লাইনে সে অনেক বেশি এক্সপার্ট। বায় বায়, মাই সিস্টার। বলেই ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গজানন দ্য গ্রেট। কিন্তু হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল বাইরে গিয়েই। টুরিস্ট এসেছে। মালপত্র নামাচ্ছে। একটা বড় প্যাকেট ছিল গজাননের গমন পথে। বেশ বড় প্যাকেট। ট্রিপল-জি তাতেই হোঁচট খেয়েছে।

এমনিতেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে। তার ওপর এই প্যাকেট। বেরোচ্ছে একটা শুভ কাজে, প্রথমেই বাধা। গজানন আবার এগুলো মেনে চলে। হাঁচি, কাশি, টিকটিকির সঙ্কেতকে বিলক্ষণ পাত্তা দেয়। তাই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেও সুড়সুড় করে ফিরে এল ঘরে। এসেই দেখল সোফায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে চোখ বড়-বড় করে উঠে বসেছে পুঁতিবালা।

গজাননকে ব্যাজার মুখে ফিরে আসতে দেখেও চোখ নামিয়ে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছে দেখে ট্রিপল-জি-এর আর সহ্য হল না। দুন্দুভি কণ্ঠে হুঙ্কার ছেড়ে বললে, সিনেমার পেজ নাকি?

পড়া হয়ে গেছিল পুঁতিবালার। বিস্ফারিত চোখে কাগজখানা দিল গজাননের দিকে, পড়েছ?

পুঁতিবালা এরকম করে কেন? মরতে চলেছে গজানন, এখন কি খবরের কাগজ পড়ার সময়? কিন্তু কী আছে কাগজটায়?

হ্যাঁচকা টানে কাগজ টেনে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল গজানন। কোন খবরটা? কাগজটা তো দেখা যাচ্ছে বাংলা। কলকাতার অফসেটে পি টি এস টাইপে ছাপা।

সোফা ছেড়ে পুঁতিবালা উঠে এসে আঙুল দিয়ে দেখাল–এই বিজ্ঞাপনটা।

পড়ল গজানন।

মানুষের মগজে দশহাজার কোটির ওপর নিউরোণ রয়েছে। কিন্তু এগুলোর দশ ভাগের এক ভাগেরও বেশি নিষ্ক্রিয় থাকে। এই নিষ্ক্রিয় নিউরোণগুলোর মধ্যে মানুষের পূর্বজন্ম আর অতীতের বহু জন্মের পঞ্চেন্দ্রিয় আর মন দিয়ে অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতা স্মৃতির আকারে ধরা থাকে। নিষ্ক্রিয় নিউরোণগুলোকে সক্রিয় করলেই পূর্বজন্মের ও অতীতের বহু জন্মের স্মৃতি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মাত্র তিনমাসের মধ্যে যে-কোনও মানুষের পূর্বজন্মের স্মৃতিকে সক্রিয় করা হয়। সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যয় পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার। অগ্রিম দশ হাজার ডলার। বুকিং চলছে। যোগাযোগঃ

নিচের নাম ঠিকানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল গজানন। এ যে কলকাতার ঠিকানা। কলকাতায় এজেন্ট বসিয়ে আমেরিকার এক্সপার্ট ব্রেনসেলে অ্যাকটিভিটি জাগিয়ে মানুষকে জাতিস্মর করে তুলছে।

ব্রেন সেল! আমেরিকাব এক্সপার্ট! অকস্মাৎ বিজনেস ম্যাগনেটদের পাগল হয়ে আত্মহত্যার হিড়িক। প্রত্যেকেই আমেরিকাব কুল ড্রিঙ্কস কোম্পানির বিষনজরে ছিল।

ফ্যালফ্যাল করে বিজ্ঞাপনটার দিকে চেয়ে থাকে গজানন। দশহাজার কোটিরও বেশি নিউরোণ এর দশ ভাগের নভাগ নিষ্ক্রিয়। তাদের খাঁটিয়ে নিলে পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে পাওয়া যায়। কোটি কোটি নিষ্ক্রিয় নিউরোণের মধ্যে আরও অনেক ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে, যা এই জন্মেরই ব্যাপার। পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগানোর আগে এই জন্মের অকল্পনীয় সেই শক্তিগুলো কি জেগে উঠছে না? সেই শক্তি দিয়ে একটার-পর-একটা সুস্থ মানুষকে পাগল করে দেওয়া কি খুব কঠিন?

বোঁ-বোঁ করে মাথা ঘুরতে লাগল গজাননের। কাগজটা মাটিতে ফেলে দিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাধা পেলে যে একটু বসে যেতে হয়, তাও ভুলে গেল।

.

অ্যাকশন

ঠিক দুটোর সময়ে বিশাল পাইন গাছটার তলায় পৌঁছল গজানন। দূরে দূরে কিছু কপোত-কপোতী প্রেমালাপে বিভোর। গজাননের মাথার মধ্যে তখন এমনই গোলমাল চলছে যে, এদিকে ওদিকে কৌতুকী চাহনি নিক্ষেপ করবার মতো মেজাজও নেই।

কিন্তু অনিমা মেয়েটা গেল কোথায়? পরপর দুদিন এল, আজকেই আরও বেশি করে আসা দরকার। কেননা রাম সিং পটল তুলেছে। রহস্য আরও বেশি গম্ভীর হয়েছে। চোখের সামনে অরুণাভর কালো পাথরের চকচকে মুখ আর বিরাট টাক ভেসে উঠছে। দু-চোখের স্পার্ক যেন কলকাতা থেকে ছুটে এসে গায়ে ছ্যাকা দিচ্ছে। মনের অবস্থা খুবই খারাপ। অনিমাটার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে নেওয়া খুবই দরকার। কিন্তু বেআক্কেলে মেয়েটা ঠিক আজকেই ডুব দিল?

ত্রিশূলের কারসাজি নয় তো? নির্দেশ বেতারে–অ্যাসাইনমেন্ট ফেলিওর লিকুইডেট গজানন!

আপনা থেকেই হাতটা চলে যায় বগলের তলায়। কে জানে এই মুহূর্তে কোন ঝোপে রিভলভার তাগ করছে অনিমা। অথবা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে যে হাঙ্গামা হয়ে গেল সম্প্রতি, বোটানিক্যাল গার্ডেনে একজনের লাশ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

গাছের গুঁড়ির দিকে সরে যায় গজানন। গুঁড়িতে পিঠ লাগিয়ে বাঘের মতো তাকায় আশেপাশে। ঠিক এই সময়ে পায়ের তলায় কী খচমচ করে উঠতেই লাফিয়ে ওঠে হরিণের মতো।

রিভলভার চলে এসেছে হাতে, গুলিও বেরিয়ে যেত আর একটু হলে। কিন্তু কাকে গুলি করবে গজানন? ওই খবরের কাগজটাকে? পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলেছে বলে?

কিন্তু একটুকরো পাথর দিয়ে কাগজটা চাপা দেওয়া কেন? পাছে উড়ে যায় বলে? এত যত্ন করে কে কাগজ রেখে গেল এখানে?

গুটিগুটি এগিয়ে গেল গজানন। বলা যায় না কাগজের তলায় হয়তো বিস্ফোরক আছে। কাগজ তুললেই ফাটবে প্রলয়ঙ্কর শব্দে। ত্রিশূলের অসাধ্য কিছু নেই।

কাছে এসে হেঁট হল গজানন। আরে, এ যে সেই বাংলা কাগজটা, একটু আগেই পড়তে দিয়েছিল পুঁতিবালা। পাথরটা যেখানে চাপা দেওয়া রয়েছে, তার ওপরের লাইন কটা পড়া যাচ্ছে মানুষের মগজে দশহাজার কোটির বেশি নিউরোণ...

নিচের ঠিকানাটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তবে কী, তবে কী, এই খবরটাতেই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এক কপি খবরের কাগজ এখানে চাপা দিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে? রেখেছে কে?

নিশ্চয় অনিমা। ত্রিশূল এজেন্ট।

বিদিগিচ্ছিরি এই কেসটার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কি তাহলে কোটি-কোটি নিউরোণ-এর রহস্য?

মাথা ঘুরে যায় গজাননের। আস্তে-আস্তে বসে পড়ে ঘাসের ওপর। পাখির ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়ে। এটা ওর একটা গ্রেট ক্যাপাসিটি। মনের সেফটি মেক্যানিজম। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছালে আপনিই ঘুম এসে যায়। মন শান্ত হয়ে যায়।

.

ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রা দিয়েই ধড়মড় করে উঠে পড়ল গজানন। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছতে হবে ভিডিও গেম-এর আসরে।

এবং পৌঁছল ঘড়ি ধরেই। তখন রোদ্দুর একটু-একটু করে মুছে যাচ্ছে দার্জিলিং-এর বুক থেকে। বড়-বড় ছায়া এগিয়ে আসছে একটার-পর-একটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে।

আচ্ছা এর মধ্যেই সরগরম। ঘর বুঝি ফেটে যাচ্ছে অনেকগুলো ভিডিও গেম-এর সম্মিলিত মিউজিক আর আওয়াজে। এক কোণে চলছে জুয়া।

তার পাশেই ওই হট্টগোলের মধ্যে চেয়ার টেবিল পেতে মদ্যপান করে চলেছে কিছু লোক। আজকের সাজগোজ আরও উগ্র। কামনা জাগানো। নিতম্ব কামড়ে ধরা ব্লু জিনস-এর তলায় টাইট গেঞ্জি গোঁজা। কোমরে চওড়া চকচকে বেল্ট। গেঞ্জির ওপর লেখা আই লাভ ইউ। দুই বক্ষ চূড়ার ওপর ঢেউ খেলানো অবস্থায় লেখাটা যেন জীবন্ত হয়ে দুলে-দুলে হাতছানি দিচ্ছে লুব্ধ পুরুষদের।

পুরুষগুলো কেউ নিচু ক্লাসের নয়। এই ধরনের জুয়োর আড্ডায় আর মদের আসরে পকেট ভারি না থাকলে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। গজাননকেও দশ টাকার টিপস দিতে হয়েছে। গেটম্যানকে। তাছাড়া ওর চালচলনেও যে এখন নবাবিয়ানা–যে লাইনের যে দস্তুর।

অনিমার দিকে তাকানো, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করা, এমনকী তার সঙ্গে কথাও বলা হচ্ছে। পুরু ঠোঁট বেঁকিয়ে অনিমাও হাসছে এবং লাস্যময়ীর মতোই অভিনয় করে চলেছে। কে বলবে এই মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

গজানন গুটিসুটি গিয়ে বসে পড়ল মদের আড্ডায়। অনিমা ওকে দেখেও দেখল না। প্রথমে হুইস্কির অর্ডার দিল। যে-সে হুইস্কি নয়–ভুটানি হুইস্কি হওয়া চাই। যার জোর আরও বেশি। পরপর তিন পেগ যখন শেষ হয়েছে, পাশের টেবিল থেকে কালো চশমা পরা মজবুত চেহারার লম্বামতো

একটা লোক এসে বসল ওর টেবিলে। লোকটার কালো গোঁফ দু-দিকে পাকানো এবং ছুঁচাল। গজাননের দিকে তাকিয়ে সে হাসতেই গজাননও হাসল। ভুটানি মদ্য রক্তে এনেছে বেপরোয়া ভাব। হেসেই বললে ইংরেজিতে, রাত্রে কেউ গগলস পরে? চোখের দোষ আছে বুঝি?

ঠিক ধরেছেন। একটা চোখ কানা। চশমা খুলে দেখাল লোকটা নতুন এসেছেন?

হ্যাঁ।

গেমস খেলবেন?

জানি না কী করে খেলতে হয়।

শিখিয়ে দিচ্ছি। আসুন।

এইটাই চাইছিল গজানন। তক্ষুনি উঠে গেল জুয়োর আড্ডায়। সবকটা খেলাতেই সে পোক্ত। কিন্তু এমন ভান করে গেল যেন এক্কেবারে আনাড়ি। ফলে হারতে লাগল প্রতি গেমে। আধঘণ্টাও গেল না। পাঁচ হাজার দশ টাকা হেরে বসল গজানন।

কাগজে হিসেব রাখছিল কালো চশমাধারী। স্পষ্টত খেলানো এবং খেলিয়ে পথে বসানোই এর কাজ। সব জুয়োর আড্ডায় এরকম একজন বুদ্ধিমান মাল্লম্যান থাকে। কাগজের হিসেব দেখে সে বললে–পাঁচহাজার দশ। মিস্টার, টাকাটা রাখুন, তারপর খেলবেন।

আকাশ থেকে পড়ল গজানন–অত টাকা কোথায় পাব?

তবে খেলতে এলেন কেন? শক্ত গলা কালো চশমাধারীর।

টাকা চাইলেই পাব বলে।

চাইলেই পাবেন? কে দেবে?

রাম সিং, জড়িত স্বর গজাননের, একটা কাগজ দিন চিঠি লিখে দিচ্ছি। গিয়ে নিয়ে আসুন। না পারলে আমার সঙ্গে চলুন। জ্বালাবেন না মাইরি।

কালো চশমার আড়ালে একটা চোখ ঈষৎ চমকে উঠলেও মুখের ভাবে তা প্রকাশ পেল না। গজাননের ডাইনে-বাঁয়ে পেছনে তিনজন গাঁট্টাগোট্টা নেপালি এসে দাঁড়িয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

কালো চশমাধারী চেয়ে আছে তো আছেই। গজাননের মুখের প্রতিক্রিয়া দেখছে। না, লোকটা খবরই রাখে না রাম সিং সুইসাইড করেছে আজই সকালে। মুখ ভাবলেশহীন, বরং একটু ক্ষুব্ধ টাকা নিয়ে চাপ দেওয়ায়। কিন্তু রাম সিং-এর সঙ্গে যার এত দোস্তি, তাকে তো চট করে ছাড়া যায় না।

রাম সিং আপনার কে হন?

দুম করে রেগে যায় গজানন (মানে রাগার ভান করে)–তাতে আপনার দরকার কী?

কালো চশমাধারী আর কথা বাড়ায় না। কলম আর প্যাডটা এগিয়ে দিয়ে বলে, লিখুন।

ঝড়াঝড় করে ইংরেজিতে লিখে দিল গজানন:

মাই ডিয়ার রাম সিং,

আই অ্যাম ইন এ ফিক্স। কাইন্ডলি হ্যান্ডওভার ফাইভ থাউজ্যান্ড টু দ্য বেয়ারার অফ দিজ লেটার। আই শ্যাল মীট ইউ টুমরো। ইওরসজ্ঞানপান।

প্যাড থেকে চিঠি ছিঁড়ে নিয়ে কালো চশমাধারী পকেটে পুরতে-পরতে বললে, কোথায় আছেন আপনার রাম সিং?

মনে-মনে বলল গজানন, শালা, বাজিয়ে নিচ্ছ আমাকে? মুখে বললে–লোহিয়া প্যালেস, জলাপাহাড়। কুইক। বেরিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল কালো চশমাধারী। গজানন তখনও চেঁচিয়ে চলেছে–হেই, গেট মী মোর ড্রিঙ্কস। আই ওয়ান্ট টু ড্যান্স। হু উইল ড্যান্স উইথ মী?

বলেই এদিক-ওদিক চাইল গজানন। হাত বুলিয়ে নিলে বাঁ-গালের কাটা দাগটার ওপর। বডি থ্রো করার আগে এটা করা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ক্রিকেট মাঠে বল করার আগে প্যান্টে বল ঘষে নেওয়ার মতো। গজাননের হাতে-পায়ে বিদ্যুৎশক্তির আধারগুলো পটাপট ছিপিখোলা হয়ে যায় গালের ওই পুরোনো ক্ষতস্থানে হাত বুলোলেই।

অনিমা ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে; চোখে বিজাতীয় দৃষ্টি। বন্ধুত্বর বাষ্পটুকুও নেই। ঘর থেকে সটকান দেওয়ার একটাই পথ। দরজার ঠিক পাশেই দু-হাত বুকের ওপর জড়ো করে দাঁড়িয়ে যেন পাথরপ্রতিমা, শরীরী বিস্ময়।

গাল থেকে হাত নামাল গজানন এবং দুহাতের দুই ঝটকায় ডাইনে-বাঁয়ের দুই নেপালী পুঙ্গবকে দশ হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে কামানের গোলার মতো ধেয়ে গেল দরজার দিকে।

গজানন দ্য গ্রেটের এ হেন আচমকা ছিটকে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউই। সেই ফাঁকেই দরজায় পৌঁছে গেল গজানন। চাপা গলায় অনিমার দিকে না চেয়ে শুধু বললে– ল্যাং মার আমাকে।

অনিমা মেয়েটি সাঙ্ঘাতিক ধুরন্ধর। মুখখানায় একটু মঙ্গোলিয়ান ধাঁচ আছে বলেই মনের কথা মুখে ফোটে না। কিন্তু চকিতের মধ্যে বুঝে নিল একঘর বিমূঢ় শত্রুর আস্থা কুড়োতে গেলে গজাননের নির্দেশ অতি উত্তম।

অতএব অতি উত্তমভাবে ডান পা-টা সামনে বাড়িয়ে ল্যাং মারল অনিমা। লিখতে যেটুকু সময় গেল, তার অনেক কম সময়ের মধ্যে ঘটে গেল সমস্ত ব্যাপারটা। এক ফুট দূর থেকে গজানন বললে ল্যাং মারতে, এক ফুট এগিয়ে আসতেই ল্যাং মারল অনিমা এবং দশ ফুট দূরে মুখ থুবড়ে পড়ল ট্রিপল-জি।

হই-হই করে তেড়ে এল পেছনকার জুয়ারিরা। লাফিয়ে পড়ল গজাননের ওপর। গোলমালের মধ্যে দরজা দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল অনিমা।

ঘা কতক খেয়ে মনে হল নেশা ছুটে গেছে গজাননের। বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি চড় পড়ল কাটা গালটার ওপর ব্লাইটার। যার গাল এরকম কাটা, সে যে সাধুপুরুষ নয়, আগেই বুঝেছিলাম। বল তুই কাদের এজেন্ট?

এজেন্ট? ককিয়ে ওঠে গজানন, কারবার-টারবার কিছুই নেই আমার, এজেন্সি নিতে যাব কেন? কেক! ঘুসি পড়েছে তলপেটে। দম আটকে আসে গ্রেট গজাননের। মনে কিন্তু খুশির ফেয়ারা। কাজ ভালোই এগুচ্ছে। এবার বডি সার্চ করুক। রিভলভারটা বেরিয়ে যাক। নিয়ে যাক ওদের ঘাঁটিতে...

ঠাস।

মাথা ঘুরে যায় গজাননের। সেই সঙ্গে ছিটকে পড়ে চেয়ার থেকে। বুকের ওপর জুতোর হিল ঘষছে একজন। আর একজন ঠিক কণ্ঠার ওপর। আর একজন দ্রুত বড়ি সার্চ করে হোলস্টার থেকে বার করে ফেলেছে রিভলভারটা।

রিভলভার এখন কালো চশমাধারীর হাতে। মুখ তার ক্রুর, করাল। কণ্ঠে শঙ্খচূড়ের রক্ত হিম করা গজরানি, আগেই বুঝেছিলাম। থাক এখানে। আসছি আমি।

গজাননও তাই চায়!

.

মনের শক্তি

দার্জিলিং শহর থেকে যে রাস্তাটা নেপালের পশুপতি মন্দিরের দিকে গেছে, যে পথ দিয়ে অবাধে নেপাল থেকে বিদেশি সামগ্রী কিনে আনে পর্যটকরা, সেই পথের বেশ কয়েক জায়গায় দু-পাশে গভীর পাইন অরণ্য নেমে গেছে ঢালু পাহাড় বেয়ে, কোথাও বা উঠে গেছে মেঘলোকের দিকে।

কালো চশমাধারী হেঁটেই বেরিয়ে এল শহর থেকে। হাঁটছে লম্বা-লম্বা পা ফেলে। অন্ধকারে আর কুয়াশায় বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। পেছন ফিরে তাকালেও তাই সে দেখতে পেত না অনিমাকে। চিতাবাঘের মতো নিঃশব্দে সে আসছে পেছন-পেছন।

জঙ্গলে ঢুকে পড়ল কালো চশমাধারী। বড়-বড় গাছের তলা দিয়ে সরু পায়ে-চলা রাস্তা। শেষ হয়েছে একটা দোতলা কটেজ প্যাটার্নের বাড়ির সামনে।

ফ্যান-লাইটের তলায় গিয়ে দাঁড়াতেই খুলে গেল সদর দরজা। ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিতেই সামনে এসে দাঁড়াল সুবেশ সুন্দর এক পুরুষ। গালে চাপ দাড়ি। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। কিন্তু সারা মুখে যেন নিষ্ঠুরতা মাখানো। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিটাও নির্মম।

নির্মম হাসি হেসেই বললে লোকটাসমসের, কী ব্যাপার? হঠাৎ এলে কেন?

রাম সিং-এর এজেন্ট জালে পড়েছে। গেমস-এর আড্ডায় এসেছিল। আনব এখানে?

ম্যাডামকে জিগ্যেস করতে হবে। একা এসেছ?

হ্যাঁ।

ইউ ফুল। স্পাই এনেছ পেছন-পেছন।

স্পাই!

ওই দ্যাখো। দেওয়ালের গায়ে ক্লোজড সার্কিট টিভি স্ক্রিনের দিকে আঙুল তুলে দেখায় নিষ্ঠুর বদন ব্যক্তি। রঙিন পরদায় দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে থেকে পা টিপেটিপে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে আসছে চাবুক চেহারা একটি মেয়ে। টাইট গেঞ্জিতে বুকের ওপর লেখা–আই লাভ ইউ।

অনিমা ভাবতে পারেনি শহরের এত কাছে স্কাউড্রেলগুলো ঘাঁটি গেড়েছে। এই পথ দিয়ে গাড়ির স্রোত বয়ে যায় সকাল সন্ধ্যা। কিন্তু রাস্তা থেকে দেখাই যায় না জঙ্গলের ভেতরকার এই নিরালা বাড়িটাকে।

ভেতরে কোনওমতে যদি ঢুকতে পারা যেত...

আগে বাড়িটাকে এক পাক ঘুরে দেখে নেওয়া যাক। পথ নিশ্চয় আছে। জঙ্গলের মধ্যে পাহারার কড়াকড়ি নাও থাকতে পারে।

পেছন দিকে এসে কিন্তু ভুলটা ভাঙল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল কালো চশমাধারী সেই লোকটা। হাতে রিভলভার। মোলায়েম গলায় বললে–ভেতরে এসো সুন্দরী। বাইরে বড় ঠান্ডা।

বড় ঘরটায় চেয়ারে বসে অনিমা। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। টাইট গেঞ্জি লুটোচ্ছে মেঝেতে। নিষ্ঠুর বদন ব্যক্তির একটা হাত তার বাম স্তনে মোচড় দিচ্ছে, এখনও বলো মহারানি তুমি কাদের এজেন্ট?

বলব না।

খুব মিষ্টি স্বর ভেসে এল করিডরের দরজার কাছ থেকে, রূপকুমার, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। তোমরা পাবে পরে।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য রকমের স্থূলকায়া এক মহিলা। চর্বি ঝুলে পড়েছে সারা দেহে, গালে চিবুকে। মাথার চুল ঝুঁটি করে ওপরে বাঁধা। আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে ঠোঁটে লাল রং মেখে থাকায়। ফরসা গাল এমনিতেই লালচে। শুধু একটা ব্লাউজ আর স্কার্ট শরীরের কদাকার মেদবহুল অংশগুলোকে প্রকটতর করে তুলেছে।

থপথপ করে অতি কষ্ঠে গুরুভার দেহটাকে অনিমার সামনে নিয়ে এল চর্বির এই সচল পাহাড়টি। লাল ঠোঁট বেঁকিয়ে গা ঘিনঘিনে হাসি হেসে বললে, তুমি কাদের বাড়ির মেয়ে গো?

যমের বাড়ির–গা রি-রি করছে অনিমার। বুকটাও টনটন করছে শয়তানটার কদর্য হাতের নিষ্পেষণে। মুখ দিয়ে ভালো কথা বেরোয়?

নোংরা হাসি আরও একটু নোংরা হল প্রৌঢ়ার মুখে, বড় কষ্ট দিচ্ছে এরা, না? মেয়ে মানুষই মেয়ে মানুষের দুঃখ বোঝে। রূপ থাকা বড় জ্বালা, বাছা। হাত ধরে অনিমাকে চেয়ার থেকে উঠাল চর্বির পাহাড়। অনিমাও টুক করে মেঝে থেকে উলের গেঞ্জিটা কুড়িয়ে নিয়ে পরে নিল মাথা গলিয়ে। বুকে ঢেউ খেলে গেল লেখাটা–আই লাভ ইউ।

সে কী হাসি প্রৌঢ়ার, ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস, আই লাভ ইউ। কাম উইথ মী। সমসের, রূপকুমার, তোমরা এখানেই থাকো।

ম্যাডাম, আর একজন রয়েছে গেমস-এর আড্ডায়।

সমসেরের কথায় কান দিল না ম্যাডাম।

ছোট ঘর। প্রায় অন্ধকার বললেই চলে। একটা শুধু ঘেরাটোপ দেওয়া টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে বড় সোফার পাশে।

অনিমাকে নিয়ে পাশাপাশি বসে আছে ম্যাডাম। দৃশ্যটা বিচিত্র। একজনের দেহের যৌবনের বন্যাকে আঁটসাঁট পোশাকে বাগে রাখার চেষ্টা; আরেকজনের চেষ্টা চর্বির বোঝাকে বেঁধেসেঁধে রাখার।

ম্যাডাম চেয়ে আছে অনিমার দিকে। কৌতুকভরা ছোট চোখ। অনিমার কিন্তু কেন জানি অস্বস্তি লাগছে চোখে-চোখে চাইতে। চোখ নামিয়ে নিতেই অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলায় হাসল ম্যাডাম নাম কী তোমার?

বলব না।

আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছ না কেন?

ঘেন্না হচ্ছে বলে।

তাকাও–আচম্বিতে কর্কশ হয়ে ওঠে ম্যাডামের স্বর। আরও শক্ত হয়ে যায় অনিমা।

তাকাও–অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগে অনিমার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। নিজেকে এলিয়ে দিতে ইচ্ছে যাচ্ছে, আলগা হয়ে যেতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

তাকাও। অদৃশ্য একটা শক্তি ওর চাহনিকে টানছে, টানছে, টানছে, ম্যাডামের দিকে!

চোখ তোলে অনিমা।

ম্যাডাম চেয়ে আছে। ছোট চোখ দুটো এখন অগ্নিগর্ভ। যেন দু-দুটো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। ভলকে ভলকে অদৃশ্য শক্তিধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ শক্তি চোখে দেখা যায় না। শক্তির উৎস কিন্তু এই দুটো চোখ। চোখ না চুম্বক? দৃষ্টি সরাতে পারছে না কেন অনিমা? শুধু ওই চোখ ছাড়া আশেপাশে যেন আর কিছুই নেই। অনিমা নিজেও যেন আর নেই। ওই চোখ। ওই চোখ তাকে গিলে নিয়েছে।

ভালো লাগছে?–অনেক দূর থেকে যেন ভেসে-ভেসে আসে ম্যাডামের মধুর স্বর। ঠিক যেন মা কথা বলছে। অনেক, অনেক বছর আগে হারিয়ে যাওয়া মা।

হ্যাঁ।

প্রাণ খুলে কথা বলোএককেবারে গোড়া থেকে বলো। যখন স্কুলে পড়তে, যখন ছোট্ট ছিলে, তখন থেকে।

বলব, সব বলব, মানসিক চাপ, ভীষণ, অসহ্য, মন খুলে কথা বলার কেউ ছিল না।

আমাকে বলো।

বলছি।

.

গজাননের পরীক্ষা

গজানন গ্যাঁট হয়ে বসেছিল চেয়ারে। গেমস-এর আড্ডা এখন খালি। মেশিনগুলো নিস্তব্ধ। ছজন ভদ্রবেশি গুন্ডা তাকে ঘিরে বসে সিগারেট টানছে। আর সকৌতুকে দেখছে

গজাননের নস্যি নেওয়া। নৈঃশব্দ্য খান-খান হয়ে যাচ্ছে এক-একটা টিপ নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে।

কালো চশমাধারী ঢুকল ঘরে। মুখভাব অনেক নরম–চলো হে টিকটিকি।

টিকটিকি! আশেপাশে তাকায় গজানন; কোথায় টিকটিকি?

এতক্ষণ যারা নস্যি নেওয়ার ধরন দেখে অতিকষ্টে হাসি চেপে রেখেছিল, এবার তারা হেসে উঠল ঘর ঝাঁপিয়ে।

মুখ শক্ত হয়ে যায় কালো চশমাধারীর, মস্করা হচ্ছে? এসো।

কোথায়?

আমার বস্-এর কাছে।

ও! চলো! যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাল ছেড়ে দিয়ে কাঁধ নাচায় গজানন। মনটাও নেচে ওঠে সঙ্গে-সঙ্গে। তখন যদি জানত অদৃষ্টে ওর কী আছে, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটিয়ে পিঠটান দিত ওইখান থেকেই।

জঙ্গলের মধ্যে নিরালা বাড়িটার সদর দরজা খুলেই দাঁড়িয়েছিল রূপকুমার। যেন যাত্রার হিরো। পেছনে থেকে আচমকা গজাননের কাঁধে রাম রদ্দা মারল সমসের। হুড়মুড় করে ভেতরে ঠিকরে গেল ট্রিপল-জি।

সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য সামলে নিল নিজেকে। কণ্ঠে জাগল চিল-চিৎকার, বলি, ব্যাপারটা কী? এইটুকু রাস্তা গাড়ি করে জামাই-আদরে এনে–

কথা আটকে গেল বিদ্রূপতরল একটি কণ্ঠস্বরে। বিদ্রুপের সঙ্গে মেশানো রয়েছে বেশ খানিকটা পৈশাচিকতার গরল।

গজানন নাকি? এসো, এসো, আমি বলেছিলাম বলেই তো অত খাতির করে এনেছে তোমাকে?

লাটুর মতো ঘুরে যায় গজানন। থিরথির করে কঁপে গালের কাটা দাগটা।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে মেদবিপুলা এক প্রৌঢ়া। দু কানের লতিতে দুটো সোনার রিঙ। ঠোঁটে থ্যাবড়া করে লাগানো লাল রং। মাথার চুল উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। ডাইনি নাকি? মনে-মনে বলে গজানন।

মুখে বলে বিষম বিস্মিত স্বরে–আপনি?

নিরীহ একটি মেয়েছেলে, বাবা। সাতে নেই, পাঁচে নেই।

কিন্তু এই গুন্ডাগুলোর ব্রেন আপনিই?

রক্ত মাখানো ঝুলে পড়া ঠোঁট দুটো অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বেঁকে যায় হাসতে গিয়ে।

হ্যাঁ, আমি। শুনলাম, তুমি নাকি কি সব দুষ্টুমি করেছ। এসো, এসো, কাছে এসো।

দুষ্টুমি? পকেটে পয়সা নেই বলে রাম সিং-এর কাছে চিঠি পাঠানো–

তুলতুলে নরম হাতে গজাননের দু-হাত চেপে ধরে ম্যাডাম। ছোট চোখে আর ভিজে ঠোঁটে দুজ্ঞেয় সেই হাসি–রাজপুত্তুরের মতো চেহারা! আহা! মেয়েরা নিশ্চয় জ্বালাতন করে?

নরম ছোঁয়াটার মধ্যে কী যেন ছিল। গা শিরশির করে ওঠে গজাননের। কণ্ঠস্বর স্খলিত হয়, জুয়ো, আনাড়ি তো, তাই–

কথা বলতে গেলেই চোখের দিকে তাকাতে হয়। গজাননও তাকিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে অনুভব করল অদৃশ্য শক্তির একটা ঝাঁপটা যেন ওকে

টলিয়ে দিয়ে গেল। ভয়াবহ শক্তি। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যেন দুরমুশের ঘা লাগল সমস্ত সত্তায়।

মিহি গলায় বিমূঢ় গজাননের চোখে চোখ রেখে বললে ম্যাডাম সত্যি? বুড়িকে মিথ্যে বলতে নেই, বাবা।

নিস্তেজ গলায় বলে গজানন–সত্যি।

ছোট চোখ দুটোকে আরও কাছে নিয়ে আসে ম্যাডাম। তারকা-রন্ধ্রে ও কীসের শিখা। আচমকা বিস্ফারিত হয়ে ওঠে দুই চক্ষু। গজাননের দৃষ্টিপথে এখন কেবল ওই চোখ, ভয়াল, ভয়ংকর, পৈশাচিক, মোহময়!

গজানন, ও গজানন, মন খুলে বলো; সব কথা বলো।

ব-বলেছি তত; জুয়ো খেলতে এসেছিলাম, পকেটে..পকেটে...

আচমকা শিথিল হয়ে গেল ম্যাডামের চাহনির বজ্র আঁটুনি। গজাননের হাত ছেড়ে দিয়ে বললে কর্কশ গলায়–মিথ্যে কথা! জুয়ো খেলাটা তো একটা দুর্বলতা। অনেক বেশি শক্তিমান তুমি।

মা-মানে?

তোমার চোখের মধ্যেই রয়েছে অনেক কথা। অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ তুমি, গজানন। গজানন, গজানন, তোমার চোখেই দেখেছি যে আমার প্রতিবিম্ব।

অত কথার দরকার কী? রাম সিং-র কাছে চিঠিটা পাঠান, টাকা এসে যাবে। আমাকে রেহাই দিন।

সোফায় বসল ম্যাডাম। দু-হাত একত্র করে থলথলে মুখখানা ফিরিয়ে রইল গজাননের দিকে, ইন্টারেস্টিং। অনেক কিছুই জানো দেখছি।

হ্যাঁ, জানি, হঠাৎ খেপে যায় গজানন, কী জানি বলুন তো? মুরোদখানা দেখা যাক।

মুরোদ দেখতে চাও? হাসছে ম্যাডাম। সেই রকম শিথিল ঠোঁট বেঁকিয়ে বিকৃত হাসি, গা ঘিনঘিন করে গজাননের বৎস গজানন, যদি বলি তুমি একটা জঘন্য নোংরা স্পাই? এসেছ আমার কাজে নাক গলাতে?

বললেই হল?

কিম্ভুতকিমাকার ম্যাডাম শুধু ইশারা করল হাত নেড়ে। সমসের খুলে দিলে একটা দরজা। পায়ে-পায়ে ঘরে ঢুকল অনিমা।

আচ্ছন্ন অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে গজানন প্রাণপণে। দু-হাত দু-পাশে ঝুলিয়ে অমন পুতুলের মতো হাঁটছে কেন অনিমা? টগবগে ঘোটকীর মতো যে তেজস্বিনী, তার আপাদমস্তকে এ ধরনের আড়ষ্টতা কেন?

বিদ্রুপের ছুরি ঝলসে ওঠে ম্যাডামের তীক্ষ্ণ স্বরে,–চেনা-চেনা মনে হচ্ছে তাই না? একই দলের দুই স্পাই, তাই না?

তুখোড় গজানন তখন নির্নিমেষে চেয়ে আছে অনিমার দারুপুত্তলিকার মতো দেহবল্লরীর পানে। তাই চাবুকের মতো জবাবটা জিভে এসেও জড়িয়ে গেল,জীবনে দেখিনি।

মেপে-মেপে পা ফেলে আরও একটু এগিয়ে এল অনিমা। মিশরের মামী নাকি? গজানন চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে। কোথায় যেন বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার ঘটে গেছে! অনিমা অমন শূন্য চাহনি মেলে রয়েছে কেন তার দিকে? চোখের মণি দুটো দু-টুকরো আয়নার মতো চকচক করছে

তো, ঠিক যেন ঘষা কাঁচ!

গজাননের বুকে বুক ঠেকিয়ে বললে অনিমা, যে স্বরে বললে তাতে উত্থান নেই, পতন নেই, প্রাণ নেই, উত্তাপ নেই; ঠিক যেন একটা যন্ত্র কথা বলে গেল যান্ত্রিক স্বরে–চিনি, একে আমি চিনি, ত্রিশূলের এজেন্ট। এর সঙ্গেই দেখা করতে বলা হয়েছিল আমাকে।

গজানন কি অজ্ঞান হয়ে যাবে?

সোফায় বসে মিটিমিটি হাসছে ম্যাডাম।

না, অজ্ঞান হয়ে যায়নি গজানন। সে পাত্রই সে নয়। ব্রেনটা কিন্তু নিমেষে তরতাজা হয়ে উঠেছিল। বুঝে ফেলেছিল কীসের প্রভাবে অনিমা আর নেচে বেড়াচ্ছে না, হেঁকে-হেঁকে কথা বলছে না, তেড়েমেড়ে ল্যাং মারছে না!

হিপনোটিজম্! ম্যাডাম ডাইনি তার ওপরেও সম্মোহনের ম্যাজিক দেখাতে গেছিল। ল্যাজেগোবরে হয়েছে। অনিমা বেচারা হাজার হোক মেয়ে তো, ডাইনির খপ্পরে পড়েছে।

নিবিড় চোখে অনিমা চেয়ে রয়েছে ওর দিকে, ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে। চাহনির মধ্যে নেই সেই প্রাণময়তা।

সোফার বসে মাথা তুলে বললে ম্যাডাম, কী গো গজানন, এবার কথা শোনো, খুলে বলো কী মতলবে আসা হয়েছে? মিছে বলে লাভ নেই দেখতেই তো পাচ্ছ।

চোয়ালের হাড় কঠিন হয়ে ওঠে গজাননের,যা বলবার তা বলা হয়ে গেছে। অত সহজে আমাকে ঘায়েল করা যাবে না।

ঘড়ঘড় শব্দে হেসে ওঠে ম্যাডাম। হাসির আওয়াজ যে এমন বিকট বিদিগিচ্ছিরি হয়, জানা ছিল না গজাননের।

ম্যাডামের চোখ আবার ছোট হয়ে এসেছে। ভিজে লাল ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে–সবাই তাই বলে, গজানন। তারপর ন্যাতা হয়ে পড়ে থাকে আমার কাছে। বিরাট পাঁজর খালি করা দীর্ঘশ্বাসে যেন ভেঙে খানখান হয়ে যায় ম্যাডাম,–বেচারারা!

অবাক হয় গজানন। একই গলায় কতরকমই আওয়াজ শোনা গেল এইটুকু সময়ের মধ্যে। একটু আগেই কদর্য হাসি আর কর্কশ হুমকি। আবার এখন তা মখমল কোমল, কবোষ্ণ, স্নেহময়।

রূপকুমার আর সমসের মিটিমিটি হাসছে গজাননের দিকে চেয়ে। অনিমার চোখের পাতা পড়ছে না। চর্বির পাহাড় দুলিয়ে অনামিকা নাড়িয়ে বলছে ম্যাডাম–গজানন, কী চাও। মেয়েমানুষ

মদ? ক্ষমতা না টাকা? খারাপ চাও তো, তাও পাবে। সব ব্যাপারেই সাহায্য পাবে আমার। মনের গোপনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নগুলোকে যদি ভোগ করতে চাও

কিছু চাই না। যা বলবার বলেছি, বলেই ঘুরে দাঁড়ায় গজানন। পা বাড়ায় সদরের দিকে। কিন্তু রূপকুমার আর সমসের তো সেখানে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভোলা দরজা দিয়ে আরও এক মস্তান চেহারার মাসলম্যান এসে লোলুপ চোখে তাকিয়ে রয়েছে গজাননের দিকে। যেন কতদিন পেটাই-কর্ম হয়নি। হাত নিশপিশ করছে। সারা মুখে বসন্তর ক্ষত, চোখ দুটো কটা আর বাঘের চোখের মতো পাশবিক।

পেছন থেকে ভেসে আসে ম্যাডামের মোলায়েম হাসি-উচ্ছল স্বর।

গজানন, জানি না কেন তোমাকে দেখেই আমার ভালো লেগে গেছে। নিশ্চয় একটা-না একটা দুর্বলতা তোমার ভেতরেও আছে। যদি না-ও থাকে, বানিয়ে দেব আমি। রূপকুমার, বেরোতে দিও না।

রাইট, ম্যাডাম, এগিয়ে আসে তিন চক্রী এক সাথে।

গজানন এখন কী করবে?

.

ছুঁচের মহিমা

ছোট্ট ঘরটায় শুইয়ে ফেলা হয়েছে গজাননকে। পাশবিক হাসি হাসতে হাসতে বসন্ত ক্ষতআকীর্ণ লোকটা চেপে রয়েছে ওর দুটো হাত। রূপকুমার ধরেছে দুটো পা। মাথাটা ঠুসে ধরেছে সমসের। গজানন নিরুপায়। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা অ্যাম্পুল থেকে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জে ওষুধ টেনে নিচ্ছে ম্যাডাম।

গর্জে ওঠে গজানন–এই মুরোদ! হিপনোটিজমের ক্ষমতা নেই, আরক দিয়ে ঘুম পাড়াতে চান?

জলহস্তীকে কখনও হাসতে দেখা যায় শব্দ না করে? না। পশুরা হাসতে পারে না। কিন্তু মানুষ পারে। ম্যাডামের মুখে এখন যে হাসিটা দেখা গেল, তা জলহস্তীরা দেখলে তাজ্জব হয়ে যেত।

বৎস গজানন, তোমার মতো কুঁচো চিংড়িকে আমার পুরো মুরোদটা দেখাতে চাই না, তাই এই ইঞ্জেকশন। ঠান্ডা মেরে আনবে, বড় ক্ষতি হবে না।

বড় ক্ষতি মানে?

অব্যাহত রইল জলহস্তী হাসি মানে, তোমার ইচ্ছেটাকে জোর করে যদি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই–তা হলে, তা হলে পাগল হয়ে যাবে, গজানন। আমি চাই তোমাকে আমার গোলাম, আমার প্রেমিক, আমার পুত্র বানিয়ে রাখতে। নানাভাবে তোমার ওই মজবুত শরীরটাকে চাই কাজে লাগাতে।

শয়তানী! তুই-ই তাহলে জোয়ারদারকে পাগল করেছিস?

বেশি জেনে ফেলেছ, গজানন।

তুই পারিস আমাকে জাতিস্মর করে তুলতে?

চমকে উঠল ম্যাডাম। চমকে উঠেছে সমসেরও। হাত শিথিল হয়ে গেছে। গজানন ঘাড় বেঁকাতে পারছে। গনগনে চোখে ম্যাডাম চেয়ে আছে তার দিকে।

গজানন, জাতিস্মর হতে চাস?

হ্যাঁ, চাই।

কিন্তু কীভাবে জানলি আমার সে ক্ষমতা আছে?

আছে না কচু। আমেরিকায় গিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করলেই ব্রেনের নহাজার কোটি নিষ্ক্রিয় নিউরোণকে সক্রিয় করতে গিয়ে হয়তো মনের শক্তি একটু বেড়ে গেছে। পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরিয়ে আনা অত সোজা নয়। পারে শুধু মুনি-ঋষিরা।

গজানন!

চোপরাও মাগী! গজানন এবার ফ্রি ল্যাংগুয়েজ ছাড়তে থাকে–আমেরিকায় কোটিপতিদের টাকা খেয়ে ইন্ডিয়ার লাখোপতি কোটিপতিদের খতম করে চলেছিস একে-একে। তোর মুখে থুথু দিতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

তাই নাকি? তাই নাকি? টকটকে লাল হয়ে ওঠে ম্যাডামের মুখমণ্ডল সমসের! রূপকুমার। পঞ্চানন! কিল হিম! কিল হিম! খুব বেশি জেনে গেছে! অ্যাট ওয়ান্স!

.

ত্রিশূল

অন্য ঘরে খাবার টেবিলে বসেছিল অনিমা। ছুরি কাঁটাচামচের দিকে চেয়ে রয়েছে নির্নিমেষে। পুতুলের মতো হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। এক হাতে ছুরি, আর এক হাতে কাঁটা চামচ। এবার কেক কাটবে। খাবে।

কিন্তু চোখ আটকে গেল কাঁটা চামচে। চেয়েই রইল। চোখ আর সরে না। চোখের পাতাও পড়ে না।

ঈষৎ সঙ্কুচিত হল চক্ষুতারকা। সম্মোহিত হওয়ার পর এই প্রথম চোখ কুঁচকোচ্ছে সে। কারণ কঁটাচামচের তিনটে মাত্র কাঁটার গড়নটা তার যেন চেনা-চেনা লাগছে।

কোথায় যেন দেখেছে...।

মন ছেয়ে ফেলছে ওই তিনটে কাটা, মিলেমিশে যাচ্ছে আরও তিনটে সূচীতীক্ষ্ণ শলাকার সঙ্গে।

ত্রিশূল!

যেন বজ্রালোকে ঝলকিত হল অনিমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তর। অব্যাখ্যাত এক দীপ্তি নিমেষ মধ্যে ঘুচিয়ে দিল সম্মোহনের নিরন্ধ্র তমসা।

ত্রিশূল।

কাটাচামচটা দেখতে ত্রিশূলের মতো।

সে ত্রিশূলের এজেন্ট।

এখন কোথায়? শত্রুপুরীতে। ত্রিশূলের আর একজন এজেন্ট গজানন কোথায়? শত্রুদের হাতে!

কঁটাচামচ টেবিলে রেখে উল্কাবেগে দরজা দিয়ে করিডরে বেরিয়ে গেল অনিমা। সামনেই সেই ছোট ঘর। ঘরের মধ্যে বিদিগিচ্ছিরি গলায় চেঁচাচ্ছে ম্যাডাম কিল হিম! কিল হিম! খুব বেশি জেনে গেছে। অ্যাট ওয়ান্স!

অনিমা যেন সাইক্লোন হয়ে গেল মুহূর্তে। দমকা বাতাসের মতো ঢুকল ঘরে। রূপকুমার রিভলভার বার করেছে, তুলছে গজাননের খুলি লক্ষ্য করে।

শূন্যপথে ধেয়ে গেল অনিমার পেটাই শরীর। দু-পায়ের মধ্যে রিভলভারটা মুঠো থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অবতীর্ণ হল খাটের ওপাশে, পরমুহূর্তেই পায়ের ফাঁক থেকে রিভলভার তুলে নিয়ে বিনা দ্বিধায় পরপর গুলি করে গেল সমসের, পঞ্চানন আর রূপকুমারকে। হতভম্ব তিনজনেরই খুলি গেল উড়ে, নিষ্প্রাণ দেহগুলো লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

লুটিয়ে পড়ার আগেই অবশ্য তড়িৎ গতিতে শয্যা থেকে উঠে পড়েছে গজানন। একটি মাত্র হনুমান লম্ফ দিয়ে গিয়ে পড়েছে ম্যাডামের ওপর। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে

শূন্যপথে উড়ন্ত মানবী, গুলিবর্ষণ এবং হনুমান লম্ফ দেখে জলহস্তিনী ম্যাডাম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিল। হাত থেকে সিরিঞ্জটা কেড়ে নিয়ে পাট করে বাহুমূলে বিঁধিয়ে দিল গজানন।

বললে আকর্ণ হেসে-ঘুম, ঘুম, টানা ঘুম এবার। ম্যাডাম, চোখ মেললেই দেখতে পাবে খাঁচাঘর। গুড নাইট।

ঘুমিয়ে পড়ল ম্যাডাম।

তারপর?

গোপন সে কাহিনি এখানে লেখা যাবে না।

জিরো জিরো গজানন রেগেছে

বেপারীটোলা লেনের এয়ারকন্ডিশনড চেম্বারে বসে দৈনিক হযবরল কাগজের একটা খবর পড়েই সোজা হয়ে বসল গজানন।

পুঁতিবালা।

নিস্তব্ধ ঘরে আচমকা বাজখাঁই ডাক শুনেই চমকে উঠল বেচারা পুঁতিবালা। হাতে কোনও কাজকর্ম নেই। কাত হয়ে বসে তাই আদিরসাত্মক ছবির বই দেখছিল, এমন সময়ে ব্রেনের ওপর এক ধাক্কা।

হাত থেকে বইটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

সটান হয়ে বসে থাকা গজাননের চোখ গিয়ে পড়ল মলাটে।

চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। সেকেন্ড কয়েক চেয়ে থেকেই যেন সভয়ে চোখ বন্ধ করল গ্রেট স্পাই।

বলল বজ্রগর্জনে, বইটা মুড়ে রাখ।

চোখ মুদেই বললে কিছুক্ষণ পরে–রেখেছিস?

ভেসে এল পুঁতিবালার করুণ স্বর–হ্যাঁ।

চোখ খুলল গজানন। চোখে রক্তের ছিটে। প্রমাদ গুণল পুঁতিবালা। পুঁতি, আবার ওইসব ছাইপাঁশ দেখছিস?

সময় কাটছিল না।–

ড্যাম ইওর সময়। গোল্লায় যাচ্ছে দেশটা...গোল্লায়! একদল ছেলেমেয়ে হেরোইন খেয়ে মরছে–আর একদল পর্নোগ্রাফি নিয়ে মাতছে। ছ্যাঃ...ছ্যাঃ...ছ্যাঃ!

শরমে মরে গেল পুঁতিবালা। যৌবনের পাখা যখন ফুরুক-ফুরুক করে সবে বেরোতে আরম্ভ করেছে, তখন অভাবের জ্বালায় সেই যে স্বভাবটা নষ্ট করে ফেলেছিল, এখনও তার ছিটেফোঁটা রয়ে গেছে ভেতরে-ভেতরে। চড়া দুনিয়া আর কড়া গজাননদাকে লুকিয়ে মাঝেমধ্যে একটু-আধটু এদিক-ওদিক করে ফ্যালেকিন্তু এরকম হাতেনাতে ধরা পড়েনি কখনও।

পুঁতিবালার লজ্জারাঙা অবনত নয়ন মুখখানার দিকে চেয়ে মায়া হল গজাননের। অমনি জল হয়ে গেল চিড়বিড়ে রাগটা।

হযবরল কাগজটা পুঁতিবালার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললে গ্রেট গজানন–পাপিষ্ঠা। খবরের কাগজ না পড়লে স্পাইগিরি করা যায় না কতবার আর বলব?

পাপিষ্ঠা গালাগালটা গজাননের নরম মুডের গালাগাল। বুকের ধড়ফড়ানিটা একটু কমল পুঁতিবালার। একে তো ওই বাবরি চুল আঁকাল বটগাছ বললেই চলে–তারপর কটমট চাউনিতে যদি রক্তের ছিটে দেখা যায় হৃৎপিণ্ডটা মনে হয় যেন সাঁৎ করে তলপেটেই গেল নেমে। মা দুর্গার অসুরকে দেখেও এত ভয় হয় না।

চোখ তুলে মিঠে সুন্দরী পুঁতিবালা প্রথমে দেখল ছুঁড়ে ফেলে-দেওয়া কাগজটার দিকে। তারপর আড়চোখে দেখে নিল গজাননের চোখ দুটো।

না। রক্তের ছিটে নেই, চোখও আর পাকানো অবস্থায় নেই।

ধাতস্থ হয়ে কাগজটা তুলে নিল পুঁতিবালা।

কাষ্ঠ হেসে বললে, কোন পৃষ্ঠায়? কত নম্বর কলমে?

এঃ! বিদ্যে জাহির করা হচ্ছে আবার! দে, দে, দেখিয়ে দিচ্ছি। কাগজ হাতে উঠে গেল পুঁতিবালা লীলায়িত ভঙ্গিমায়–দেখেই আবার খেঁকিয়ে ওঠে গজানন–এটা কি নাট্যশালা? আঁ? বৈজয়ন্তীমালার নাচ হচ্ছে নাকি?

ফিক করে এবার হাসল পুঁতিবালা। লিপস্টিক রাঙানো পাতলা ঠোঁট জোড়ার তলায় যেন লাইনবন্দি কমল হিরে ঝিলমিলিয়ে উঠল।

বলল, মাগো! কী ব্যাকওয়ার্ড! বৈজয়ন্তীমালা এখন আর নাচে না–রিটায়ার করেছে। এম পি হয়েছে জানো না?

হয়েছে নাকি? ঢোক গেলে গ্রেট গজানন। স্পাই বিজনেসে এসে ইস্তক সিনেমা-টিনেমাগুলোও রেগুলার দেখা হচ্ছে না। দেখলেই তো সময় নষ্ট। দেওয়ালের পোস্টারটা এক ঝলক দেখেও নিল। বড়-বড় হরফে সেখানে লেখা আছেটাইম ইজ মানি। সময়ই হল গিয়ে টাকা।

কই? কোন খবরটা গজানো?

চমকে ওঠে গজানন–এই তো এইটা!

খবরটা পড়ল পুঁতিবালা। সঙ্গে-সঙ্গে কালো কালো চোখ দুটো কীরকম যেন হয়ে গেল। বললে অস্ফুট গলায়, শম্ভ নায়েক মানে সেদিন যে এসেছিল?

হ্যাঁ। সেই শম্ভ নায়েক। হেরোইন নেশার টাকা জুগোতে-জুগোতে যে ফতুর হয়েছিল–

আত্মহত্যা করার আগে হিরোইন স্মাগলার যেন ধরা পড়ে তোমাকে কাকুতিমিনতি করে বলে গেছিল।

সেই শম্ভ নায়েকই ফট করে আত্মহত্যা করে বসল।

অথচ হিরোইন স্মাগলার ধরা পড়ল না।

পুঁতিবালার ফুটুনি স্তব্ধ হতে না হতেই বাজল লাল টেলিফোন। অর্থাৎ কল এসেছে ত্রিশূল দপ্তর থেকে।

.

২.

গজাননের কীর্তিকলাপ যাঁরা এর আগে পড়েছেন, তাঁরা জানেন ত্রিশূল কী জিনিস। শিবের হাতে যে অস্ত্রটি দেখা যায়, এ সে বস্তু নয়, যদিও মহিমায় শিবের হাতিয়ারের সমান যায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সেই গুপ্ত সংস্থা ভারতের স্বার্থরক্ষায় যার জন্ম, ভারতের মানুষ, ভারতের মাটি, ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে যার দাপটে বহু বিদেশি গুপ্তচর সংস্থারও ঘিলু নড়ে উঠেছে বিলক্ষণ।

ত্রিশূল সেন্ট পারসেন্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। কোটি-কোটি মুদ্রার খেলা চলছে ত্রিশূল এর রক্তচক্ষু অতন্দ্র রাখার জন্যে।

রামভেটকি সুরকিওয়ালা এই ভয়ঙ্কর প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় মাথা। পাঠকপাঠিকারা অনেকেই জানেন, রামভেটকিকে দেখলে মানুষের শাখামৃগ পূর্বপুরুষদের কথা মনে পড়ে, কম্যান্ডো থাকার সময়ে বেমক্কাগুলি খেয়ে সে হাঁপানি রোগে ভোগে এবং এন্তার তাড়ি খায় (হাঁপানির ওষুধ বলে)! প্রতাপে আর ব্যক্তিত্বে, নিষ্ঠুরতায় আর বিচক্ষণতায় সে কিন্তু অদ্বিতীয়।

এহেন রামভেটকির কর্কশ স্বর ধ্বনিত হল গজাননের কর্ণরন্ধ্রে লাল টেলিফোনের রিসিভার কানে লাগাতেই।

জিরো জিরো গজানন?

আই, আই, স্যার, মার্কিন সিনেমা দেখে এই বুকনি সম্প্রতি রপ্ত করেছে গজানন।

হেরোইন মানে নায়িকা নয়...জানা আছে তো?

আই অ্যাম নট সো ফুল, স্যার।

জানি, জানি, গজানন। হেরোইন যে দেশটাকে জাহান্নমে নিয়ে যাচ্ছে, তাও নিশ্চয় জানো।

সেই কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। শম্ভু নায়েক সুইসাইড করেছে।

ওটা সুইসাইড নয়–হোমিসাইড।

মা...মানে?

মার্ডার। হেরোইন স্মাগলারের ঠিকানা বের করার চেষ্টা করেছিল শম্ভু নায়েক, তাই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

কপালের শিরা ফুলে ওঠে গজাননের নাম কী ব্যাটাচ্ছেলের?

তার আসল নাম কেউ জানে না। হেরোইন কিঙ নামেই তার নাম ডাক নেশারু মহলে।

হেরোইন কিঙ!

ইয়েস, মাই ডিয়ার গজানন—

জিরো জিরো গজানন।

অফকোর্স, অফকোর্স জিরো জিরো গজানন। আমার এক এজেন্ট তার হাতে গতকাল খুন হয়েছে।

আপনার এজেন্ট?

ডাবল এজেন্ট বলতে পারো। হেরোইন কিঙের এজেন্টকে আমারও এজেন্ট বানিয়েছিলাম। কাঁটা দিয়ে কাটা তোলা বলতে পারো। কিন্তু ধুরন্ধর কিঙ তাকে গতকাল শেষ করে দিয়েছে।

কোথায়? কীভাবে?

বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু মাল আসছিল। এই এজেন্টকে ভার দেওয়া হয়েছিল। আর আমি তাকে ভার দিয়েছিলাম, ওই সূত্র ধরে কিঙকে কাত করতে। কিন্তু..

.

কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছিল অন্যরকম। রামভেটকি সুরকিওয়ালা নিজেও তা জানে না।

বিজু সেন নমাসে ছমাসে একবার ফিল্ডে নামে, মানে মাল পাচার করে। মোটা মুনাফা লুটে হাওয়া হয়ে যায় মাস কয়েকের জন্যে। শিলং থেকে গোঁয়ার নানান খানদানি হোটেলে তাকে দেখা যায় বিভিন্ন বিউটির সঙ্গে, দামি সুরা আর দামি গাড়ি নিয়ে মেতে থাকে মাসের পর মাস।

সে একা। একেবারে একা। প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আসরে সঙ্গী নেওয়া বিপজ্জনক। তাই সে একা।

মাথায় সে খুব লম্বা নয়, খুব বেঁটেও নয়। কিন্তু পেটাই চেহারা। নাক-মুখ-চিবুকের গড়ন দেখে মনে হয় বুঝি মার্কিন মুলুকে তার জন্ম। বিশেষ করে তার টকটকে গায়ের রং আর কোবাল্ট ব্লু চোখ দেখে ভুল করে অনেকেই।

বিদেশিনী মা আর ভারতীয় বাবার মিশ্র শোণিত ধমনীতে ধারণ করেই সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাই তার চেহারায় সাগরপারের ছাপ এত বেশি।

চরিত্র? অতীব নিষ্ঠুর। টাকা ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। এই দুনিয়ায় টাকা থাকলেই সব থাকে–নইলে সব ফক্কা। নিকষ এই তত্ত্ব এবং জীবনদর্শন বিজু সেনকে অমানুষ করে তুলেছে। কৈশোর থেকেই।

ইছামতী নদীর ধারে এই বিজু সেনকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছিল গত রাতে–এ কাহিনি যখন শুরু হচ্ছে, ঠিক তার আগের রাতে।

নদীর ওপারে বসিরহাটের আলো দেখা যাচ্ছে। টর্চের নিশানা করতে হবে এপার থেকে। নৌকো চলে আসবে তক্ষুনি। তিরিশ কিলো সাদা গুঁড়ো নিয়ে সেই নৌকোয় চেপে বসবে বিজু সেন।

তিরিশ কিলো! ছেষট্টি পাউন্ড। খাঁটি সাদা গুঁড়ো। হেরোইন। পলিথিন প্যাকেটে মোড়া রিফাইনড হেরোইন। প্রায় ষোলো কোটি টাকার মাল। খুচরো বাজারে গেলে দশগুণ দাম।

জীবনে এত টাকার মাল পাচারে নামেনি বিজু সেন। চার মাস ঘাপটি মেরে থেকেছে সে। এইরকম মোটা একটা দাঁও পেটার জন্যে। ছেষট্টি পাউন্ড হেরোইন পাচারই অবশ্য তার মূল লক্ষ্য নয়।

বিজু সেন খুন করতে চায় হেরোইন কিঙ-কে। স্মাগলার নৃপতিকে স্বহস্তে নিধন করে সে নিজেই রাজ সিংহাসন দখল করতে চায়। চার মাস ধরে সেই প্রস্তুতিই চালিয়ে এসেছে সে।

আকাঙ্ক্ষা তার আকাশচুম্বী–স্বপ্ন ছুঁয়ে যায় স্বর্গকে। হেরোইন কিঙ-এর অনেক মাল সে পাচার করেছে, লুটেছে অনেক টাকা, জেনেছে অনেক গলিঘুজির খবর–হেরোইন আমদানির কারবারে যা নিতান্তই দরকার।

এবার তাই সরে যেতে হবে স্বয়ং রাজামশায়কে। রাতের অন্ধকারে নীলকান্তমণির মতো জ্বলছে বিজু সেনের কোব্যাল্ট ব্লু নয়নযুগল। বুকে ঝুলছে হাইপাওয়ার বাইনোকুলার। ইনফ্রারেড লেন্স লাগানো দূরবীন। যাতে রাতের অন্ধকারেও হাজার গজ দূর থেকে সামান্যতম নড়াচড়াও চোখ না এড়ায়।

ঢিলে শার্টের তলায় বগলের ফাঁকে চামড়ার ফিতেতে ঝুলছে পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের রিভলভার। হয়তো দরকার হবে না। বিপদ এলে অস্ত্র চালানোরও সুযোগ মিলবে না। রাইফেল

আনেনি সেই কারণেই...

হিপ পকেটের টর্চটাই কাজে লাগাবে নৃপতি-নিধনের পর। ইস্পাতকঠিন ঠোঁট বেঁকিয়ে মৃদু হাসে বিজু সেন।

ধুরন্ধর কিঙ কিন্তু একাজের ভার তাকে দেয়নি। মজাটা এইখানেই। ছেষট্টি পাউন্ড হেরোইন পাচার হবে বাংলাদেশের বর্ডারের ওপর দিয়ে

এ খবরটা তাকে দিয়েছে একজন পুলিশ দারোগা।

বিজু সেনের অন্তরে তাই সামান্য সংশয় আছে বইকী। দারোগা যে খবর জানে–সে খবর নিশ্চয় আরও অনেকে জেনে বসে আছে। কিঙ বরাবর কাজ করে নিখুঁতভাবে–এবারে বিজু সেনকেও সে জানায়নি। কিন্তু জেনেছে দারোগা।

রাত দশটা। সময় হয়েছে। কয়েকশ গজ চওড়া এই ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে এখুনি আসবে কিঙ। মাঠের ওপারে নারকেল গাছগুলোর তলা দিয়ে আবির্ভূত হবে তার মূর্তি।

ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসল বিজু সেন।

মিনিট পনেরো পরেই দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তিকে। পরনে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। হাতে একটা ব্যাগ। হনহন করে মাঠ পেরিয়ে আসছে।

দূরবীন কষতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়েছিল বিজু সেনকে। দুলে উঠেছিল ঝোঁপটা। তারার আলোর ঝিকিমিকিও নিশ্চয় দেখা গেছিল দূরবীনের লেন্সে।

জীবনমরণের খেলায় সামান্য ওই ভুলটুকুই যথেষ্ট।

মাঠের ওপারে কয়েকশ গজ দূরে ঝোঁপের মধ্যে লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল শক্তিশালী ম্যাগনান আগ্নেয়াস্ত্রের–টেলিস্কোপিক নাইট-শাইট ফিট করা মারণাস্ত্রের বুলেটটা নিক্ষিপ্ত হল নির্ভুল লক্ষে।

বিজু সেনের টুটি উড়ে গেল। বিশাল গর্ত দিয়ে কলকল করে বেরিয়ে এল রক্ত।

মাঠের মাঝে লুঙ্গি পরা লোকটা চমকে উঠল আওয়াজ শুনে। দশটা টাকা তাকে দেওয়া হয়েছে ব্যাগটাকে মাঠ পার করে দেওয়ার জন্যে। নদীর ধারেই নাকি লোক দাঁড়িয়ে আছে। বর্ডার পেরোলেই...

কিন্তু গুলি ছুঁড়ল কে? কার দিকে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে যাচ্ছে নিরীহ মানুষটা, মারণাস্ত্র থেকে ছুটে এল লক্ষ্যভেদীর আর একটা বুলেট। হৃৎপিণ্ড ছুঁড়ে বেরিয়ে গেল মৃত্যুদূত।

ঝোঁপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেল হেরোইন কিঙ। বিজু সেন যে ডাবল এজেন্টের কাজ নিয়ে তাকেই নিকেশ করে হেরোইন-সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন দেখছে–এখবর পেয়েই জাল পাততে হয়েছিল কিঙকে। টোপ ফেলেছিল অনেক কায়দা করে।

রামভেটকি সুরকিওয়ালা কল্পনাও করতে পারেনি পুরো প্ল্যানটা কিঙ-এরদারোগাও তার হাতের পুতুল। অজান্তে কবর রচনা করে ফেলেছে বিজু সেনের।

.

৩.

গজানন, কী বুঝলে? রামভেটকির প্রশ্নটা টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে এসে কিলবিলিয়ে ওঠে গ্রেট গজাননের ব্রেনের মধ্যে।

দাঁতে দাঁত পিষে বাজনা বাজানোর চেষ্টা করল গজানন। দেখে মুখ টিপে হেসে ফেলে পুঁতিবালা। কিড়মিড় আওয়াজের বদলে একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ গিয়ে পৌঁছল রামভেটকির কানে।

গজানন, এটা কিসের শব্দ?

আমি রেগেছি।

রেগেছ? জিরো জিরো গজানন রেগেছে। তবে আর কী, কিঙ এবার কঙ হবে।

কিঙ কঙ হবে?...

মানে, কি কঙের যে দশা হয়েছিল, তাই হবে। মানে, পটল তুলবে। তাই তো?

ইয়েস, বস্। গজানন তার মুন্ডু ছিঁড়বে। গেণ্ডুয়া খেলবে। কিন্তু তাকে পাব কোথায়?

সেটাই তোমার কাজ। খুঁজে নিতে হবে।

খুঁজব কোন চুলোয়?

ল্যাঙ্গুয়েজ!...ল্যাঙ্গুয়েজ!..মাই ডিয়ার গজানন, তুমি হলে ভীষণ ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড টঙ্কার–ত্রিশূলের বাণ নিয়ে ধ্বংসের মন্ত্র কপচাতে-কপচাতে যাচ্ছ অভুত প্রলয়কে অঙ্কুরে বিনাশ করতে। তোমার মুখে চুলোয় শব্দটা মোটেই খাপ খায় না।

বসো, আমার মাথা ভেঁ-ভো করছে আপনার ল্যাং...ল্যাং..

ল্যাঙ্গুয়েজ শুনে–এই তো? বৎস গজানন, বৎস বললাম বলে ফির ভি রেগে যেও না। তুমি যাচ্ছ সেই খাঁটি বাংলাভাষার দেশে–

আই মীন বাংলাদেশে?

ইয়েস, ইয়েস, মাই বয়, গ্রেট হারামজাদা কিঙ এখন রয়েছে বাংলাদেশে।

হেরোইন নিয়ে আসেনি ইন্ডিয়ায়?

বড্ড হুঁশিয়ার যে! ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েই পিছু হটে গেছে। বিবরে প্রবেশ করেছে।

স্যার, বিবর না কবর–কী বললেন?

ননসেন্স! বেলেঘাটায় থেকে তোমার কালচারটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে দেখছি।

এইবার আঁতে ঘা লাগে গজাননের। মাতৃভূমির নিন্দে শুনলে যে কোনও স্বদেশপ্রেমীরই গোঁসা হয়। আমাদের গ্রেট গজাননও বেলেঘাটায় মাটিকে ভালোবাসে।

অতএব সে গর্জে উঠল তৎক্ষণাৎ মিঃ রামভেটকি সুরকিওয়ালা!

ভড়কে গেল রামভেটকি কী..কী হল?

আপনি জানেন, যার আছে অনেক টাকা, সেই থাকে বেলেঘাটা?

তা-আমি তো জানতাম, যার নেই পুঁজিপাটা, সেই থাকে বেলেঘাটা।

ওটা আগেকার কথা। এখন দিন চেঞ্জ হয়েছে। এটাও কি জানেন, যার আছে অনেক টাকা, তার থাকে ইজ্জৎ, কালচার?

তা...হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, গজানন।

তাহলে কথা ফিরিয়ে নিন। বলুন বেলেঘাটায় থেকে গজাননের কালচার এক্কেবারে ভালচার হয়ে গেছে।

ভা...ভা...ভালচার! কিন্তু ভালচার মানে তো

শকুনি। আমিও তাই। স্পাইরা শকুনি ছাড়া আর কী? অনেক উঁচুতে উড়লেও নজর থাকবে ঠিক ভাগাড়ের দিকে–যেখানে দেখিবে মড়া, ঠোকরাইয়া দ্যাখো তাই।

গজানন, ইউ আর গ্রেট।

আই অ্যাম! আই অ্যাম! গোঁফ নেই, তবু গোঁফে তা দিয়ে নেয় গজানন। কালচারের সঙ্গে ভালচারের মিলটা ফটাং করে মাথায় এসে গেল। সত্যিই, কী রহস্যময় ব্রেন।

পুঁতিবালা পর্যন্ত অবাক হয়ে দেখছে গজাননকে। কী অপূর্ব কালচার! ভালচার না হলে আদর্শ স্পাই তো হওয়া যায় না। মাতাহারির কথা মনে পড়ে যায় পুঁতিবালার। মাতাহারিকে যদিও ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। রাইফেলের নলচেগুলো কিন্তু লক্ষ্যস্থির করতে পারেনি। সমানে বুক দুলিয়ে গেছিল মাতাহারি ট্যারা করে ছেড়েছিল রাইফেলধারীদের।

কী দুর্জয় সাহস। মৃত্যু সামনে–অথচ বুক দোলাচ্ছে মাতাহারি। আপন মনেই নিজের পীন পয়োধরা একবার দুলিয়ে নেয় পুঁতিবালা।

পরক্ষণেই মাতাহারির স্বপ্ন টুটে যায় গজাননের আচমকা চিৎকারে, কী বললেন? কিন্তু এখন

টেলিফোনে ভেসে এল কড়া ধমক–গজানন, আর কোনও কথা নয়, শহরটার নাম টেলিফোনেও বলা ঠিক নয়। বড় ক্রশ কানেকশান হচ্ছে আজকাল। কোড ল্যাঙ্গুয়েজে যা বললাম। তা মনে রেখো। ঠিক দু-ঘণ্টা পরে একটা লাল রংয়ের পটিয়াক গাড়ি যাবে বেপারীটোলা লেনে। তোমাকে সটান বর্ডার পার করে ঠিক সেই জায়গাটায় পৌঁছে দেবে। গাড়ি থাকবে তোমার হেপাজতে। বাংলাদেশের ড্রাইভার্স লাইসেন্স করা আছে–তোমার পাশপোর্ট হচ্ছে মহম্মদ হোসনের নামে। ইন্ডিয়ান টুরিস্ট। বুঝেছ?

জি হ্যাঁ। পুঁ

তিবালাকে নেওয়া যাবে না।

যাবে না?

না। বড় ডেঞ্জারাস গেম, গজানন। কিঙ ওই শহরেই আছে খবর পেয়েছি। সাদা গুঁড়োও তার কাছে। তুমি তাকে খুঁজে বের করবে, মুন্ডু ছিঁড়বে–

গেণ্ডুয়া খেলব।

যা খুশি। যদি তার আগে তোমার মুণ্ডু ভেঁড়া যায়?

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে!

ননসেন্স!

লাইন ডেড হল। গজানন প্রোজ্জ্বল চোখে পুঁতিবালার দিকে চাইল। বলল, এই ছুঁড়ি, এবারকার অ্যাডভেঞ্চারে তোর ঠাই নেই।

পুঁতিবালা কিছু বলল না। একটা কথাও না।

কিন্তু পুঁতিবালা যে কী চীজ, তা গজাননও জানত না। মেয়েরা যখন গুপ্তচরী হয়, বাঘিনীদেরও হার মানায়। পুঁতিবালা যে লাইন থেকে এসেছে, সে লাইনে মোহিনী হওয়ার ছলাকলা শিক্ষার বিলক্ষণ স্কোপ ছিল। পুঁতিবালা এই মস্ত আর্ট-টি রপ্ত করেছে।

বাকিটা তার বডি খেলিয়ে ঠিক ম্যানেজ করে নেয়।

ফলে, বাংলাদেশের সেই শহরটিতে গজানন যখন ঢুকল তার গাড়ি নিয়ে অনেক পেছনে একটা ট্যাক্সিতে বোরখাপরা একটা মেয়েকেও দেখা গেল-ফলো করছে গজাননকে। গজানন গিয়ে উঠল একটা ফাইভ স্টার হোটেলে, পুঁতিবালাও (বোরখা পরিহিতা) উঠল সেখানে। রেজিস্টারে গজানন নাম লেখালো মহম্মদ হোসেন। পুঁতিবালা লিখল সুলতানা

রাজিয়া। তারপর কী অপূর্ব কৌশলে, কী দৈবক্রমে জানা নেই–দু-জনেরই ঘর পড়ল পাশাপাশি–একই করিডরে।

তখন রাত হয়েছে। হোটেলের ঘরেই ধড়াচূড়ো পালটে নিল গজানন। রিভলভারটা নেবে কি নেবে না ভাবল সেকেন্ড কয়েক। তারপর না নেওয়াটাই ঠিক করল। যাচ্ছে তো খড়ের গাদায় উঁচ খুঁজতে। সিকিউরিটিতে রিভলভার ধরা পড়লেই যাবে সব গুবলেট হয়ে।

এদিকে পাশের ঘরে পুঁতিবালা কী করছে?

বোরখা ছুঁড়ে ফেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে। পটাপট ব্লাউজ খুলে সড়াৎ করে শাড়ি আর সায়া খুলে–না...না...অতটা সে যায়নি!)...পরনের একটি মাত্র জাঙ্গিয়ার মতো পরিধেয়কে লোলুপ নয়নে দেখছে। একবার নিতম্ব নাচিয়ে দেখে নিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

আছে, আছে। পুঁতিবালা এখনও মরেনি। মাতাহারিও বোমকে যাবে তার এই অপ্সরী মূর্তি দেখলে। বুকের এক চিলতে আবরণী থাকুক দরকার হলে টান মেরে খুলে ফেলা যাবে।

রাইফেল, রিভলভার, চাকু, হাতবোমকেও এখন আর ভয় পায় না পুঁতিবালা। মুখের রং টঙগুলো আর একবার ফ্রেস করে নিল গজাননের চ্যালা। কিঙকে রং নিয়েও যদি ঘায়েল করতে না পারা যায় তাহলে পুঁতিবালার লাইন ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বোরখাটা মাথা দিয়ে গলিয়ে নিয়ে দরজা ফাঁক করে দাঁড়াল পুঁতিবালা।

আর ঠিক সেই সময়ে আঁকড়াচুলো গজানন গ্যাটর-গ্যাটর করে বেরিয়ে গেল ওর ঠিক নাকের ডগা দিয়ে। নাকে এল আতরের গন্ধ।

গজাননদা আতর মেখেছে। বলি ব্যাপারটা কী!

নীরস কাঠখোট্টা গজাননদা গন্ধদ্রব্য কস্মিনকালেও দু-চক্ষে দেখতে পারে না–নাকে শুঁকে ফেললে পচা গোবর শুঁকে ফেলেছে, এমনিভাবে নাক সিঁটকোয়।

সেই মানুষটা কিনা সারা গায়ে আতর মেখে পাঁচতারকা হোটেলের অলিন্দ পথ হাঁটছে। মতলবটা কী দেখতে হচ্ছে তো!

সুরুৎ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল পুঁতিবালা। গটগট করে চলল গজানন ওরফে মহম্মদ হোসেনের পেছন-পেছন। উঠল একই লিফটে। একতলায় নামল একইসঙ্গে। চোখ পাকিয়ে জিরো জিরো গজানন একবারটি দেখেছিল পাশের বোরখাধারিণীকে। সন্দেহ

করেনি। করবেটা কী করে? বোরখা ছুঁড়ে দেখবার ক্ষমতা তো নেই। থাকলে দেখতে পেত হেসে কুটিপাটি হচ্ছে পুঁতিবালা। আর মনে-মনে বলছে-বটে! বটে! গজাননদা! বিদেশে এসে শেষকালে কামিনীকাঞ্চনে মজবে! আমি থাকতে তা হতে দেব না। সাধনার ব্যাঘাত ঘটতে দেব না!

একতলায় লিফট থেকে বেরিয়ে গজানন জিগ্যেস করে নিল, গেমরুম কোথায়। গেমরুম মানে জুয়ো খেলার আড্ডাঘর। এ হোটেলে সে ঘর আছে একতলারও নিচে মানে পাতালঘরে।

গজানন চলল সেই দিকে। পকেটে কাড়ি কাড়ি টাকায় একবার হাত বুলিয়ে নিল। টাকার বান্ডিলে হাত বুলোলে নার্ভ-টার্ভগুলো বেড়ে ঠান্ডা হয়ে যায়!...তারপরেই জমাটি ঠেঙানি শুরু করা যায় শীতল মস্তিষ্কে।

কে জানে পাতাল ঘরে এখুনি তাই শুরু হবে কিনা! এসে গেছে গেমরুম। পুরো করিডরটা এয়ারকন্ডিশন করা। গেমরুমের দরজায় খেলাটেলার ছবি থাকলে বোঝা যেত ঘরটায় কী হয়।

কিন্তু যে ছবি রয়েছে, তা দেখলে ভুল ধারণা ঢুকে যায় মগজে।

একটা মেয়ের ছবি। ঘূর্ণমান গ্যালারি থেকে রাশি-রাশি নক্ষত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে সে যেন নেমে আসছে মতে। অহো! অবতীর্ণ হওয়ার কী অপূর্ব ছন্দ! মনোমুগ্ধকর নিঃসন্দেহে। অবশ্য সেইরকম মনই মুগ্ধ হবে এই তিলোত্তমাকে দেখলে।

কেননা, প্রথম মানব আদম প্রথম মানবী ঈভকে পরিধেয় আবিষ্কারের বহু আগে যে সজ্জায় দেখেছিল কটাক্ষময়ী এই ললনাও যে রয়েছে সেই সজ্জায়।

দেখেই সভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল গজানন। সামলে নিল অবশ্য মুহূর্তের মধ্যেই। এসব মামলা হাতে নিলে চোখ খোলা রাখা দরকার–চোখের সামনে যা-ই পড়ুক না কেন–দেখতেই হবে।

অতএব খুঁটিয়ে দেখল গজানন। কোথায় যেন পড়েছিল, ভালো করে চোখ মেলে দেখার নাম পর্যবেক্ষণ, তাই পর্যবেক্ষণ করল অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে।

খুব একটা খারাপ লাগল না। নারীদেহ বরাবরই তার কাছে একটা অজ্ঞাত মহাদেশ অথবা মহাসমুদ্র হারিয়ে যাওয়ার চান্স এত বেশি...

কিন্তু এই রূপসিটির অধরে, ললাটে, নয়নে, গ্রীবায় এবং সেখান থেকে পদযুগল পর্যন্ত প্রদেশগুলিতে এমন-এমন সব পেলব সৌন্দর্য আছে যা অচল মনকেও সচল করে দিতে পারে!

একদা মানসিক ক্লিনিকবাসী গজাননেরও ব্রেনের কোষগুলো অদ্ভুতভাবে সচল হয়ে ওঠে।

দরজার সামনে টুলে বসেছিল হোটেলের লোক। সাধারণ কর্মচারী নয়। লড়াকু চেহারা। চুল এত ছোট করে কাটা যে মুঠো করে ধরা সম্ভব নয়। চোখ দুটি মার্বেলগুলির মতো গোল-গোল। গায়ে সিকি ছটাক চর্বিও নেই। জামাটা মোটা কাপড়ের অনেকটা ফতুয়ার মতো দেখতে, প্যান্টটা তো পাছা কামড়ে রয়েছে।

ঠোঁট ফাঁক করে অত্যন্ত অমায়িক হাসি হেসে-হেসে গজাননের পর্যবেক্ষণ পর্ব অবলোকন করছিল লোকটা। হাসিটাকে অনেক ট্রেনিং দিয়ে অমায়িক করবার চেষ্টা করেও পারছিল না। মনে হচ্ছিল যেন একটা হিংস্র হায়না দাঁত খিঁচিয়ে আছে।

গজাননের পর্যবেক্ষণ পর্ব প্রলম্বিত হচ্ছে দেখে সে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বললে, ভেতরে যাবেন?

চমকে ওঠাটাকে বিউটিফুলি ম্যানেজ করে নিল গজানন। আদি জেমস বন্ড মানে সীন কোনারির চার্মিং হাসি হাসল।

বললে–অফ কোর্স।

আমি সিকিউরিটি স্টাফ। আপনাকে নতুন দেখছি, সার্চ করব।

হোয়া-ট!

অবিচল কণ্ঠ সিকিউরিটি স্টাফের নিয়মিত এলে আর করব না। ঝুঁকি নিতে চাই না। অনেক ধরনের লোক তো এখানে আসে।

অনেক ধরনের লোক এখানে আসে! এবং এই জন্যেই তো গজাননের আবির্ভাব এই নির্বান্ধব পুরীতে। পাঁচতারা হোটেলের গেমরুমে লাখ টাকার খেলা দেখাতে যারা আসে, তাদের লাখ টাকা সাদাপথে আসে না কখনওই। কালোপথে পাথর পথিকদের পেট থেকেই তো খবর পাওয়া যাবে কিঙ মহাপ্রভুর।

বুক চিতিয়ে বললে বেলেঘাট্টাই মস্তান (প্রাক্তন)–ও ইয়েস। ভাগ্যিস, রিভলভার আনেনি। সঙ্গে!

দরজা খুলে ধরল গাঁট্টাগোট্টা লোকটা। ছোট্ট একটা চেম্বার। তার পরের দরজাটা খুললে গেমরুমে ঢোকা যায়। পৃথিবীর সবরকম কান ফাটানো শব্দ বোধহয় সেখানে মিশেছে। ছোট্ট চেম্বারে তার রেশ ভেসে আসছে গুমগুম করে।

কম্যান্ডোর চাকরি করত নাকি কদমছাঁট এই মর্কটটা? দ্রুত হাত বুলিয়ে গেল গজাননের সর্বাঙ্গে। বাহুমূল, ঊরুসন্ধি কিছু বাদ গেল না।

কপট অমায়িক হেসে বললে, যান। খুলে ধরল দরজা গেমরুমের।

কান ঝালাপালা আওয়াজে প্রথমটা মাথা ধাঁধিয়ে গেল গজাননের। কীরকম যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মনে হল। তারপরেই তেড়েমেড়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

বোরখাপরা পুঁতিবালা দাঁড়িয়েছিল করিডরে। বোরখাটা খুলবে কিনা তাই নিয়ে ভাবছিল। গজাননদার সামনে খোলা মানেই কেলেঙ্কারি। অথচ মন চুলকোচ্ছে বডিখানা কাউকে দেখাতে স্বভাব যায় না মলে।

এসে গেল সেই সুযোগ। গজাননকে গেমরুমে চালান করে দিয়ে করিডরের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল কদমছাঁট লোকটা।

বোরখার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে রুক্ষ কণ্ঠে–ফরমাইয়ে?

দরজাটা খুলুন, কাটকাট কথা পুঁতিবালার।

বোরখা পরে ভেতরে যাওয়া যায় না।

তাই নাকি? তাই নাকি? কেন যাওয়া যায় না শুনতে পারি?

সার্চ করিয়ে যেতে হয়।

তাই বলুন। সার্চ করিয়ে গেলেই হবে। তা করুন না।

বোরখা খুলতে হবে।

তাই নাকি? তাই নাকি? এই খুললাম, বলেই হ্যাঁচকা টানে মাথা গলিয়ে বোরখা খুলে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে দিল পুঁতিবালা। দুই হাত দু-পাশে ছড়িয়ে সশব্দে তুড়ি দিয়ে কবজি ঘুরিয়ে বললে সে এক অপরূপ কায়দায়কী সার্চ করবেন, মিঃ সার্চম্যান? কী আছে আমার–এই বডিখানা ছাড়া। বলতে-বলতেই মোক্ষম মোচড় দিল বক্ষ শোভায় মাতাহারি-স্টাইলে।

চোখের মধ্যে আলপিন ফুটিয়ে দিলেও বোধহয় এত তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করত না দ্বাররক্ষক। আঁতকে উঠে দরজা খুলে দিয়ে বললে কী হচ্ছে কী খোলা জায়গায়! যান ভেতরে।

বিজয়িনী পুঁতিবালা এক পা দিল ছোট্ট চেম্বারে।

বললে ঘাড় ঘুরিয়ে--মিঃ সার্চম্যান, সার্চ করবেন কি বন্ধ জায়গায়? আসুন, আসুন, কতক্ষণই বা আর লাগবে।

ভেতরের দরজা খোলার জন্যে বেগে ছোট্ট চেম্বারে প্রবেশ করতে যাচ্ছে কদমছাঁট–গায়ে গা ঘষটে যেতেই এককালের বাজারি মেয়ে পুঁতিবালা দেখিয়ে দিল তার ফর্মটা।

ঝাঁ করে জাপটে ধরল বেঁটে লোকটাকে। সশব্দে চুম্বন করল ঠিক ঠোঁটের ওপর। সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। করিডর থেকে বোরখাটা তুলে নিয়েই পরে নিল চোখের পলক ফেলতে ফেলতে। ফিরে এল চেম্বারে। মূহ্যমান কদমছাঁটকে বললে দেবী চৌধুরানির গলায়–খুলুন দরজা।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি গোছের শুকনো হাসি হেসে দরজা খুলে ধরল কদমছাঁট। দৃপ্ত ভঙ্গিমায় পুঁতিবালা ঢুকে গেল ভেতরে।

বোরখার মধ্যে থেকে কিন্তু তার চোখ ঘুরছে মস্ত বড় ঘরটার এদিকে থেকে সেদিকে। জগঝম্প আওয়াজে কানের পরদা ফুটিফাটা হলেও আশ্চর্য হবে না পুঁতিবালা। এ কী পাগলের কারখানা রে বাবা! একদিকে সারি-সারি ভিডিও গেম নিয়ে বিকট বাজনা বাজিয়ে জুয়ো খেলে যাচ্ছে একপাল পুরুষ এবং মহিলা। যত না খেলছে, চেঁচাচ্ছে তার চাইতে বেশি। আর এক পাশে একটা হাঁটু সমান উঁচু মঞ্চে উল্লোল নাচ নাচছে একটি

ষোড়শী, গেমরুমের সামনের দরজায় আঁকা ছবির সঙ্গে তার মিল আছে শুধু একটি ব্যাপারে...পাঠক-পাঠিকাদের অনুমানের ওপরেই সে ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া গেল।

মঞ্চের সামনে বেশ কিছু চৌকোনা টেবিল আর প্রতিটা টেবিলের চারদিকে চারখানা চেয়ারে বসে নানা বয়সি পুরুষরা উকট উল্লাসে ফেটে পড়ছে আদিম নৃত্য দেখে ষড়রিপুর প্রথম রিপুকে যা প্রজ্বলন্ত করার পক্ষে যথেষ্ট।

একজন তরুণ আর সইতে পারল না প্রথম রিপুর অগ্নিদহন। ছিটকে গেল মঞ্চের ওপর। যেন তৈরি হয়েই ছিল ষোড়শী। আঁকাবাঁকা বিজলী রেখার মতো মঞ্চের ওপর তরুণটিকে খেলিয়ে নিয়ে উন্মত্ত অট্টরোল সৃষ্টি করে সাঁৎ করে অদৃশ্য হল পেছনের দরজায়–তরুণটিও তিন লাফ মেরে ঢুকে গেল ভেতরে।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। পরমুহূর্তে আর একটি ললনা পাশের দরজা দিয়ে ছুটে এল মঞ্চে যেন গেমরুম-এর দরজায় আঁকা ছবির অনুরূপ একটি মূর্তি...শুরু হয়ে গেল হাসি মুখে মদির চোখে আদিম নৃত্য...

এতক্ষণে দম আটকে দেখছিল পুঁতিবালা। বহুবল্লভা পুঁতিবালা! কিন্তু এ হেন রাধাবল্লভী নাচ তাকেও কখনও নাচতে হয়নি।

তোবা! তোবা! বেশ বোঝা যাচ্ছে এই খেলাই চলবে সারারাত। কিন্তু জিরো জিরো গজানন গেল কোথায়? পুঁতিবালা আসবার আগেই গ্রীনরুমে উধাও হয়নি তো একটা চলমান ছবির পেছন পেছন?

বড্ড উৎকণ্ঠা হয় পুঁতিবালার। বড় আনাড়ি এই দাদাটি। তাই তো একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে হয়,–আড়ালে থেকে রক্ষা করতে হয়।

ওই তো...ওই তো গজাননদা! কিন্তু সামনে ওই মেয়েছেলেটা আবার কে? গজাননদার ঝাকড়া চুল দেখেই মজেছে মনে হচ্ছে। খুব যে হেসে-হেসে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে কথার রঙ্গ হচ্ছে! ওই তো চেহারা! কালো! তবে হ্যাঁ, চেহারায় চটক আছে বটে। কালো মেয়েরা একটু সেক্সি হয় ঠিকই। কিন্তু এই ঢলানিটা যেন একটু বেশি রকমের সেক্সি। যৌনতা বুঝি উপচে-উপচে উঠছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত গড়িয়ে-গড়িয়ে নামছে শরীরের খাঁজ খোঁদল বেয়ে পাহাড়ি ঝরনার মতো!

গজানো পটে গেল নাকি? মরেছে! তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় পুঁতিবালা, এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে উদ্দাম নাচ দেখতে থাকে, যেখানে গজাননের চোখ যাবে না কিন্তু ওদের কথা কানে ভেসে আসবে।

বলছে কী হারামজাদী? আঁ! নেমন্তন্ন করছে গজাননদাকে। বলছে ছেনালিগলায়–মিঃ ওয়ান্ডারম্যান, আপনার জন্ম কি হারকিউলিসের ঔরসে? চলুন আমার ঘরে।

পুঁতিবালার ইচ্ছে হল তেড়ে গিয়ে ঠাস করে একটা চড় কষায় আন্নাকালীর গালে। আস্পর্ধা তো কম নয়। গজানো বোঝে কি এ সবের? হারকিউলিসের সঙ্গে বাপের তুলনা! এই রাত্রে তাকে ঘরে তোলার মতলব? গজাননদা, গজাননদা, কথার ফাঁদে পা দিও না মরবে বলে দিলাম। ওই আন্নাকালী তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

কী বলছে গজানো? হাসছে। হাসিটা কিন্তু বেশ প্যাচাল ধারাল। হাজার হোক জিরো জিরো গজানন তো। কায়দা কানুনগুলো প্র্যাকটিস করছে ভালোই।

বলছে হেসে-হেসে ডার্লিং, আপনার হাজব্যান্ড অ্যাংরি হতে পারেন।

ওঃ! আবার ইংলিশ ছাড়া হচ্ছে! স্বামী মহাশয় রাগ করবেন বলেই যাওয়ার ইচ্ছে নেই। রাগ না করলেই সুড়সুড় করে চলে যেতে, তাই না গজানো? মাইরি, তোমাদের এই পুরুষ জাতটাকে দেবা ন জানন্তি–

বলে কী কেলে মেয়েমানুষটা? উৎকর্ণ হয় পুঁতিবালা।

আন্নাকালী বলছে, আমার হাজব্যান্ড এখন ডিউটিতে।

এত রাতে?

সারা রাতই তো ওর ডিউটি। তাই সারারাত আমার বড় একা-একা লাগে–ঘরে তো আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। চলুন না–

ডার্লিং, আমি এসেছি দেশ দেখতে–

ও নটি বয়! নতুন দেশের নতুন মেয়েদের আগে দেখতে হয়। আমার দেশকে ভালোবাসি বলেই তো এত ডাকাডাকি, মিঃ সন অফ হারকিউলিস!

আরে বাস্! এ যে দেখছি ছেনালিপনায় মহারানি। গজাননদা, গজানো, অমন করে আন্নাকালীর মুখের দিকে চেয়ে আছে কেন?

তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী! গজাননদা, তুমিও? তুমিও ওই মেয়ে হ্যাংলাদের দলে?

বিড়বিড় করে আবার কী বলা হচ্ছে আন্নাকালীকেও। পুঁতিবালার কানকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না, গজাননদা, যত আস্তেই বলো না কেন।

কেয়াবাত! গজাননদা, তোমার চোখ এত ধারালো?

খুব আস্তে বললেও কথাগুলো সুস্পষ্ট ধ্বনিত হল পুঁতিবালার কানে–আপনি ড্রাগ অ্যাডিক্ট? হেরোইন খান?

চোখের তারা খুব একটা কাপল না আন্নাকালীর।

বললে একই রকম নিনাদী কণ্ঠেওটা তো স্ট্যাটাস সিম্বল, মিঃ...মিঃ..

হোসেন। মহম্মদ হোসেন।

বুঝলেন কী করে?

আপনার চোখের তারা দেখে। আসলে আন্দাজ মিশিয়ে ঢিল ছুঁড়ছিল গজানন–লেগেছে ঠিক জায়গায়। আমারও ইচ্ছে যায় জিনিসটা চেখে দেখতে।

ও মাই মিঃ ওয়ান্ডারম্যান। তাহলে চলে আসুন আমার ঘরে। ভয় নেই, আমার গাড়িই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে হোটেলে।

গেল! গেল! সব গেল! পুঁতিবালা ইচ্ছে করে বোরখার ভেতর থেকেই হাউমাউ করে ওঠে। গজানো, ও গজাননদা, তোমার এতটা মতিচ্ছন্ন হয়েছে, জানা ছিল না তো! হেরোইন খাওয়ার শখ হয়েছে! আঁ! হেরোইন কিঙকে ধরতে এসে হেরোইন চেখে

দেখবার শখ হয়েছে! কী চাখতে চাও, গজাননদা! কষ্টিপাথরের মতো কালো ওই ঢলানিটাকে? ওটা তো বাজারের মেয়েরও অধম– ঘরে স্বামী থাকতে পরপুরুষ নিয়ে ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

ও কী! একি কাণ্ড! গজাননদা যে ঢলানিটার পেছন-পেছন চলল গো! ওমা কী হবে গো! ওরা যে গাড়ি করে যাবে। পুঁতিবালা সঙ্গে যাবে কেমন করে?

হিল্লে একটা হবেই। পুঁতিবালাও মেয়ে কম নয়। কোথাকার কে এসে গজাননদাকে বাগিয়ে নিয়ে যাবে–সেটি হতে দেওয়া চলবে না।

আন্নাকালীর পেছন-পেছন গ্রেট-গজানন যাচ্ছে অন্য দরজার দিকে। যে দরজা দিয়ে ভেতরে এসেছে–সে দরজা দিয়ে নয়। কেলে ঢলানি এখানকার সব খবরই রাখে তাহলে। ইস। আবার তাঁতের শাড়ি পরা হয়েছে। কালচার তো কচু! পরপুরুষকে নিয়ে রাত কাটাস। তবে হ্যাঁ, শাড়িটা চমৎকার। পছন্দ আছে বটে ঢলানির।

আগে বেরিয়ে যাক দুজনে, ওঃ! হাঁটছে দ্যাখো, ঠিক যেন কপোত-কপোতী। ঝাড়ু মার পুরুষ জাতটার মুখে। গজাননদার এতখানি অধঃপতন হবে, ভাবতেই পারেনি পুঁতিবালা।

বেরিয়ে গেছে ওরা। বেরোবে পুঁতিবালা। না কোথাও বাধা নেই। হোটেলের পেছনদিকটা যে এত অন্ধকার, কে জানত। অন্ধকারই বা হবে না কেন। যা কাণ্ডকারখানা চলেছে ভেতরে তাদের জন্যেই তো দরকার অন্ধকারের যবনিকা।

গেল কোথায় দুশ্চরিত্র দুটো? ওই তো...ওই.ওই কিন্তু একটা ছায়া কেন? হরি! হরি! দুজনে গায়ে গা দিয়ে এক হয়ে গেছে। গজাননদাকে হয় হারামজাদী চুমু খাচ্ছে, নয় তো গজাননদাই–

আচম্বিতে গাছের আড়াল থেকে ধেয়ে এল দুটো ছায়ামূর্তি।

ছিটকে সরে গেছে গজাননদা আর আন্নাকালী। আন্নাকালী ছুটছে হরিণীর মতো। কোথায় যাচ্ছে? ওহো। গাড়ি এনেছিল। সেই গাড়িতে উঠে বসে ঝড়ের মতো চালিয়ে দিয়েছে। হেডলাইটের ডবল আলোয় অন্ধকার ছিঁড়েখুঁড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দুর হতে দুরে।

গজাননদাকে দুদিক থেকে ঘিরে ধরেছে দুই আগন্তুক। ঠিক হয়েছে।

বিদেশে এসে বিদেশিনীকে আস্বাদনের বড় শখ হয়েছিল। এখন ঠেলা সামলাও।

বোরখাটা খুলে অলিম্পিক স্পিড় দেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে পুঁতিবালা প্ল্যান কষা হয়ে গেছে কীভাবে ক্যারাটে ঝেড়ে দুদিকে ছিটকে দেবে দুই হানাদারকে, এমন সময়ে...

গম্ভীর গলায় বললে একজন আগন্তুক মানিব্যাগটা বার করুন।

ব্যাগ বের করে ছুঁড়ে দিল গজানন। সঙ্গে-সঙ্গে ছুঁড়ে দিল নিজেকেও। মরি! মরি! এ সেই বিখ্যাত গজানন লম্ফ। হনুমানও যা দেখে লজ্জা পায়।

মানিব্যাগ লুফবে, না গজাননকে রুখবে? শূন্য পথে ধেয়ে আসছে যে দুটোই। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই ভ্যাবাচ্যাকা আগন্তুকের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল গজানন, তারপর গোঁ-গোঁ একটা আওয়াজ শোনা গেল।

নেতিয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে লোকটা। হাত-টাত ভেঙে দিল নাকি গজানো? গুণের তো শেষ নেই তোমার। রাগলে চণ্ডাল! উন্মাদ। কী করছ তখন আর খেয়াল থাকে না।

দ্বিতীয় লুঠেরাটা মহা ধড়িবাজ তো! ধরাশায়ী দোস্তের বুকের ওপর থেকে গজাননদা উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই তীরের মতো ছুটে এসে অন্ধকারেই ছোঁ মেরে মাটি থেকে কী তুলে নিয়ে ভো দৌড় দিল অন্ধকারে।

কাওয়ার্ড! দুটো মার খেয়ে গেলি না গ্রেট গজাননের হাতে? বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিত।

একী! গজাননদা আমার মানিব্যাগ বলে অন্ধকারে বিলীয়মান মূর্তিটার পেছনে তেড়ে যেতেই ভুলুণ্ঠিত আহত লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

রাম! রাম! এত ভীতু! জিরো জিরোর আসল খেল না দেখেই চম্পট দিলি! এখনও তো তার অ্যাসিস্ট্যান্ট নামেনি আসরে। নরম হাতের গরম ধোলাইয়ে পিত্তি ছরকুটে যেত তোদের!

বোরখাটা পরে দিল পুঁতিবালা। বডি খেলানোর যাও-বা একটা চান্স পাওয়া গেল মিল্ড হয়ে গেল।

গজানো ফিরে আসছে। পলাতকদের পালাতে দিয়ে ফিরে আসছে।

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল পুঁতিবালা।

দরজা খুলে গেমরুমে ঢুকে গেল গ্রেট গজানন। কিছুক্ষণ পরে ঢুকল পুঁতিবালা। কিন্তু গজাননকে দেখতে পেল না।

বেরিয়ে এল সামনের দরজা দিয়ে। ওই তো করিডোরের মোড় ঘুরে হোটেল অফিসের দিকে যাচ্ছে গজানো।

যাক। মানিব্যাগের জন্যে হাল্লাক হয়ে মরুক। যাচ্ছে তো নালিশ ঠুকতে। পুলিশকে খবর দেবে কি?

.

৪.

দিতেও পারে। দাদার প্ল্যানটা ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। কিঙ-য়ের শহরে পা দিতে না দিতেই এই যে হামলা, একি শুধু মানিব্যাগের লোভে?

মনে তো হয় না।

আড়াল থেকে সব দেখল পুঁতিবালা। অফিস থেকে পুলিশ অফিসেই টেলিফোন করল গজানো। তারপর গটগট করে লিফটে চড়ল। পুঁতিবালাও উঠল লিফটে। আড়চোখে তাকে একবার দেখে নিল গজানন। কটমটে চাহনি দেখে মনে-মনে হেসে কুটিপাটি হল পুঁতিবালা। লিফট থেকে সটান নিজের ঘরে ঢুকল গ্রেট গজানন। পুঁতিবালা নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একতলায়। সেখান থেকে পাতাল ঘরের গেমরুমে।

আসল গেমটাই যে এখনও খেলা হয়নি।

কদমছাঁট এবার তাকে দেখেই একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে শুধু বললে–আবার?

কী আবার? প্রচণ্ড মুখ ঝামটানি দেয় পুঁতিবালা সার্চ হবে নাকি আবার?

না, না, না, না, বলতে-বলতে দরজা খুলে ধরে পাংশু মুখে বললে কদমছাঁট–যান।

যাব তো বটেই, কিন্তু বোরখাটা রইল এখানে। যাওয়ার সময়ে নিয়ে যাব, কেমন?

–বলেই বোরখা খোলা হয়ে গেল পুঁতিবালার। ছোট্ট চেম্বারে পুঁটলি পাকিয়ে ফেলে ঝ করে ঢুকে পড়ল গেমরুমে।

সত্যিই! শেষ নেই ওই আদিম নাচের! এখনও মঞ্চে চলছে সেই একই উদোম লীলা। জঘন্য!

ওভাবে পুরুষ মজাতে সবাই পারে। পারবি পুঁতিবালার মতো? এই দ্যাখ!

কটিতে আর বক্ষদেশে যার সামান্যতম বস্ত্রের আবরণ, এহেন লাস্যময়ীর দিকে মুনি ঋষিরও দৃষ্টি চলে যায়। পুঁতিবালাও চুম্বকের মতো ঘরসুদ্ধ লোকের নজর কেড়ে নিল চক্ষের নিমেষে।

কিন্তু পুঁতিবালার নজর কাড়ল কে?

একজন পুলিশ অফিসার। বয়েস চল্লিশের ওপরে। সেই কারণেই শিকার ভালো।

তাছাড়া পুলিশের লোক। হাতে রাখা দরকার।

বার কাউন্টারে হাতে স্কচ হুইস্কি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্রোঞ্জ মূর্তির মতো সেই অফিসার। বেশ চেহারা। পছন্দ হয় পুঁতিবালার।

চোখে-চোখে আমন্ত্রণ বিনিময় হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। কাছে এগিয়ে যায় পুঁতিবালা।

এক গেলাস জিন উইথ লাইম অ্যান্ড বিটার চেয়ে নিয়ে চুমুক দিয়ে চোখ রাখে পুলিশ অফিসারের চোখের ওপর।

নেশা জড়ানো চোখ নয়। বেশ হুঁশিয়ার। কর্তব্যেনিরত নিঃসন্দেহে।

গেলাসটা চোখের সামনে তুলে ধরে মদিরার ফিকে হলুদ রংটা দেখতে-দেখতে যেন আপনমনেই বলে পুঁতিবালা–আমার নাম রাজিয়া সুলতানা। আজ এসেছি। তিনশো দু-নম্বর ঘর। একা। সঙ্গ পেলে বাঁচি।

যাচ্ছি, বলে গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে দিল পুলিশ অফিসার। খর নজর কিন্তু পুঁতিবালার ওপর।–আমার নাম আমিনুল হক। ডি আই জি। চলুন।

এক চুমুকে গেলাস শেষ করে দিয়ে কাউন্টারে রুম নাম্বারটা বলে দিল পুঁতিবালা। পেমেন্ট হবে বিলে। বডি খেলানোর সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর উদগ্র অভিপ্রায় নিয়ে অগ্রসর হল দরজার দিকে।

ছোট্ট কোর্টশিপ। পাঠক-পাঠিকারা ক্ষমা করবেন। পুঁতিবালার মতো মেয়েরা এসব মামুলি ব্যাপারে নাহক সময় খরচ করতে রাজি নয়।

.

পরের দিন ডি আই জি আমিনুল হকের সামনে এসে বসল গ্রেট গজানন।

বলল–আমিই ফোন করেছিলাম আপনাকে। আমার মানিব্যাগ চুরি গেছে কাল রাতে।

গম্ভীর গলায় বললে, ব্রোঞ্জ মূর্তি–হোটেল অফিস থেকেও কমপ্লেন এসেছে। কিন্তু আপনি হোটেলের পেছনে গেছিলেন কেন?

ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মৃদু কঠিন হাসল, ব্রোঞ্জ মূর্তি–তাহলে আপনার মানিব্যাগ খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটাকেও ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ধরতে পারেন। সরি, আপনি আসতে পারেন।

গ্রেট গজাননের মাথায় চড়াত করে রক্ত উঠে গেল কথাটা শুনেই। তারপরের কথাটা শুনেই কিন্তু রক্ত নেমে গেল মুখ থেকে।

কেটে-কেটে বললে, ব্রোঞ্জ মূর্তি–জিরো জিরো গজানন, ছেষট্টি পাউন্ডের অর্ধেক যদি আমাকে দিয়ে যান, তাহলে আপনাকে হেল্প করতে পারি।

কিছুক্ষণ সব চুপ। চোখে-চোখে চেয়ে দুই বড় খেলোয়াড়।

তারপর আশ্চর্য শান্তগলায় বললে গজানন—

সব জানেন?

জানাটাই আমার কাজ।

কিঙয়ের ঠিকানা?

এখনও জানি না। তবে জানতে পারব। আপনার পেছনে লেগে থাকলেই জানতে পারব। কেননা, কিঙ আপনার পেছনে লেগেছে।

এত তাড়াতাড়ি?

তাই তার নাম কিঙ। আপনার নিস্তার নেই, গ্রেট গজানন। মরবেনই। হয় তার হাতে, আর না হয়–একটু থেমে খুব আলতোভাবে–আমার হাতে।

চেয়ে রইল গজানন। সর্ষের মধ্যেই ভূত থাকে–সুতরাং তার চোখের পাতা কাঁপল না।

বললে, ছেষট্টি পাউন্ডের অর্ধেক দেব না। দশ পাউন্ড বড় জোর।

তেত্রিশ পাউন্ড।

না। তাহলে আগে পুঁতিবালার নাচ দেখবার জন্যে তৈরি হোন।

পুঁতিবালা। এবার কিন্তু আর চমকানি আটকাতে পারে না গজানন–সে কোথায়?

এখন বলা যাবে না। তেত্রিশ পাউন্ড।

বিশ পাউন্ড।

তেত্রিশ পাউন্ড।

ও-কে, ও-কে। রাজি। পুঁতিবালা কোথায়?

এখন বলা যাবে না।

কিঙ কোথায়?

আগে বলুন হোটেলের পেছনে কেন গেছিলেন?

এক মহিলার আমন্ত্রণে।

কী নাম তার? কীরকম দেখতে?

খুব কালো। দারুণ স্মার্ট। বিউটিফুল ফিগার। হেরোইনের নেশা আছে। তাই তার সঙ্গ ধরেছিলাম।

খুব কালো! দারুণ স্মার্ট। বিউটিফুল ফিগার! হেরোইনের নেশা আছে! নাম কী বলেছিল?

মমতাজ সিরাজ!

বিসমিল্লা।

চেনেন?

আপনি যে হোটেলে উঠেছেন, তার মালিকের বেগম।

জয় মা কালী!

গ্রেট গজানন।

জিরো জিরো গজানন।

ইয়েস, ইয়েস, আপনি আজ রাতে আবার গেমরুমে যাবেন?

সে কি আর আসবে?

দেখা যাক।

তা এল বইকী মমতাজ। স্বপ্নিল চোখে হেরোইনের আভাস ফুটিয়ে সে আবার আমন্ত্রণ করল গজাননকে। গতরাতের ঘটনা প্রসঙ্গে শুধু বললে, ভয়ে পালিয়ে গেছিলাম, মিঃ ওয়ান্ডারম্যান!

অন্ধকারের উৎপাতদের আমার বড় ভয়।

কাজেই মমতাজের গাড়ি চেপে গজানন গেল শহর থেকে দূরে নিরালা একতলা বাড়িটায়।

পুঁতিবালা তখন কোথায়?

ফাইভ স্টার হোটেলে অন্তত নেই। ব্রোঞ্জ মূর্তি যখন একটু ঘুমিয়ে ছিল, তখন ঘুমের ঘোরে সে উচ্চারণ করেছিল শুধু একটি কথা–পুঁতিবালা, মার্ভেলাস!

ব্যস, ভোর হতেই বিদেয় হল পুলিশ অফিসার। তারপর হাওয়া হয়ে গেল পুঁতিবালা।

.

হে পাঠক! হে পাঠিকা! আসুন এবার গজাননের পেছনে। দেখুন তার আজব কীর্তি।

মমতাজ গাড়ি চালায় ভালো। বাংলাদেশে বিলিতি গাড়ির ছড়াছড়ি এখন। মমতাজের গাড়ি নির্মিত জাপান দেশে। টয়োটা।

দরজা খুলে প্রথমে গজানন উঠেছিল ভেতরে। উঠেই দেখে নিয়েছিল সিটের তলায় খাঁজের মধ্যে, পয়েন্ট থ্রি এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভারটা গোঁজা আছে কিনা।

আছে। নিশ্চিন্ত হয়েছিল গজানন। এ কাজটা তাকে করতে হয়েছে মমতাজের অজান্তে। গেমরুমে রিভলভার নিয়ে ঢোকা অনুচিত। ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই টয়লেটে ঘুরে আসার নাম করে সটান গেছিল নিজের ঘরে। রিভলভারটা নিয়েই দৌড়ে গেছিল হোটেলের পেছন দিকে– যেখানে আছে মমতাজের গাড়ি। গাড়িটা কী ধরনের গত রাতেই তা দেখে রেখেছিল গ্রেট গজানন। দরজায় চাবি লাগানোর অভ্যেস নেই মমতাজের, তাও লক্ষ করেছিল চকিতে। দুই আততায়ী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মমতাজ ছুটে গিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে উঠে বসেছিল সিটে–সবই দেখেছে জিরো জিরো। তাই রিভলভার লুকিয়ে রাখার প্ল্যানটা আগে থেকেই রেখেছিল মগজের মধ্যে।

নিজে যে সিটে বসবে এখুনি, সেই সিটের তলায় রিভলভার আর কিছু বাড়তি বুলেট রেখে অন্ধকারেই ফের মিশে গেছিল গজানন। ফিরে এসেছিল গেমরুমে।

তারপর সেই একই কথার চর্বিতচর্বণ। একই কথার ছেনালিপনা। একই কথা নিয়ে ঢলাঢলি। উস্কে দিয়েছে গজানন এবারে। মমতাজ সে রাতে ডিপ ব্লু শাড়ি পরেছে। খুবই মিহি শাড়ি। অত্যন্ত হালকা। তার আশ্চর্য কালো তনু ঘিরে গাঢ় নীল বসন আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে যৌনতাকে। হেরোইন সেবন কি আজ মাত্রা ছাড়িয়েছে? যেন একটু বেশি বকছে মমতাজ। একটু যেন বেশি প্রগলভা। ক্ষণে-ক্ষণে গজাননের গায়ে গা দিচ্ছে, গালে গাল ঠেকাচ্ছে, চোখের সঙ্কুচিত তারা কাম টু-দ্য-বেড় আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছে।

গজানন ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুমান করেছে, অভিযান পৌঁছেছে সম্ভবত অন্তিম পর্বে। আমিনুল হক নামধারী পুলিশ অফিসার যখন হিরোইন কারবারে লিপ্ত এবং কিঙয়ের হদিশ জানতে আগ্রহী–তখন হোটেল মালিকের ব্যাভিচারিণী বউকে নিয়ে তার নিরালা আলয়ে গেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে।

প্রাণ দিতে প্রস্তুত গজানন। মেন্টাল ক্লিনিকের ডাক্তারবাবু শাঁখের আওয়াজের মতো গলাবাজি করে তাকে বলেছিলেন–গজানন, দেশের জন্যে তোমার ট্যালেন্টকে কাজে লাগিও নিজের জন্যে নয়।

গজানন আজ তাই এক্কেবারে বেপরোয়া। যে নরাধমরা হেরোইন প্রবেশ করাচ্ছে, ইন্ডিয়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, যুবসমাজকে মেরুদণ্ডহীন করে ছাড়ছে তাদের পালের গোদাকে সে জবাই করবে নিজের হাতে। একটার পর একটা খুন করে যাবে। সে যে রেগেছে, তার প্রমাণ রেখে দেবে রক্তগঙ্গার মধ্যে। যদি নিজের রক্তও মিশে যায় তার মধ্যে মিশুক।

কেউ তো কাঁদবে না। এক-আধফোঁটা চোখের জল হয়তো ফেলত পুঁতিবালা, সে ছুঁড়িও তো নিপাত্তা। কেনই বা এসেছিল পেছন-পেছন। আমিনুল যদি তাকে কবজা করে থাকে তাহলে সর্বনাশ।

গজানন সে চেষ্টাও করবে বলে ঠিক করেছিল, আমিনুলের কাছ থেকে ঠিকানা বের করবেই পুঁতিবালার।

কিন্তু তার আর দরকার হয়নি।

পুলিশ অফিস থেকে ফিরে হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছিল গজানন–আজই সকালবেলা। গাড়ি পার্ক করার জায়গায় ঝাড়ন হাতে দাঁড়িয়েছিল একটা ছেলে। ময়লা গাড়ি ঘষে সাফ করে দেয়। বিনিময়ে নেয় সামান্য দক্ষিণা।

গজানন গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই ছেলেটা একগাল হেসে দাঁড়াল সামনে।

হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে গেছিল গজাননের কী চাই? গাড়ি মুছতে হবে না।

নীরবে একটা চিরকুট এগিয়ে দিয়েছিল ছোকরা। তাতে মেয়েলি হাতে লেখা–দাদা গো দাদা মমতাজকে নিয়ে কাদা! আমিনুলকে সাবধান–সে জানে তোমার নামধাম!

ছড়া পড়েই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল গ্রেট গজানন। ছড়া লেখা হচ্ছে! ছড়া লেখবার সময় এটা! ফাজিল ভেঁপো মেয়ে কোথাকার! কোথায় একটু পাশে এসে দাঁড়াবে, তা না আড়ালে টিটকিরি দিচ্ছে মমতাজকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করা হচ্ছে বলে। বেশ করছে গজানন, আলবত করবে, একশোবার করবে। তুই পুঁতিবালা, তুই কি কম যাস? কাজের ফিকিরে যত অকাজ আছে–সবই তো করিস। গজানন না হয় দেশের জন্যে, দশের জন্যে মমতাজকে নিয়ে একটু খেলবে।

কিন্তু কোথায় গেল ফচকে মেয়েটা? চোখ পাকিয়ে ছোকরাকে শুধোয় গজানন–চিঠি কার কাছে পেলি?

ওই তো ওখানে দাঁড়িয়ে...যাঃ! চলে গেছে। আপনাকে তো চিনিয়ে দিল।

ননসেন্স! বলে হনহন করে হোটেলে ঢুকে গেছিল গজানন। নিশ্চিন্ত হয়েছিল অবশ্য পুঁতিবালার ব্যাপারে। আমিনুল তার টিকি ধরতে পারেনি নিশ্চয়। স্রেফ হুমকি দিয়েছিল গজাননকে।

পুঁতিবালা এই মুহূর্তে স্বাধীন। ও মেয়ে সব করতে পারে। ওর কাছে বিদেশের মাটি আর স্বদেশের মাটির মধ্যে কোনও তফাত নেই। ও জানে শুধু পুরুষ মানুষ আর নিজের বডির যাদুশক্তি। ভক্তি-শ্রদ্ধা, এমনকী একটু ভয়ও করে বটে–এই দাদাটিকে।

গজাননদার অকল্যাণ হবে জানবে তা রুখতে দুনিয়ার হেন অপকর্ম নেই–যা ওর অসাধ্য।

মমতাজ চালিত টয়োটায় বসে এইসব কথাগুলোই আর একবার ভেবে নিল গজানন। অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা বানিয়েছিল বটে। গুরুকেও বোকা বানায়। বেপারীটোলা লেনে যদি জান নিয়ে ফিরতে পারে, কান ধরে এমন একটা চড় লাগাবে...।

ব্যাকভিউ আয়নায় দেখা গেল একটি গাড়ির সাইডলাইট। বেশ দূরত্ব বজায় রেখে আসছে গাড়িটা। ফলো করছে কে? আমিনুল না পুঁতিবালা? গেমরুমে আজকে ব্রোঞ্জমূর্তিটাকে দেখা যায়নি। তাই বলে গজাননকেও নিশ্চয় নজর ছাড়া করেনি। হেরোইন কিঙের ঠিকানার লোভে হয়তো আসছে। পেছন-পেছন।

গজানন যদি দুরদর্শনের শক্তি লাভ করত সেই মুহূর্তে, তাহলে অবশ্য দেখতে পেত অন্য দৃশ্য।

চুপি-চুপি গাড়ি চালিয়ে আসছে তারই সাকরেদ পুঁতিবালা!

আমিনুল হক ওঁৎ পেতে আছে বনানীর মধ্যে সেই নিভৃত আলয়ে–যেখানে বৃন্দাবনলীলা চলেছে প্রতি রাতে। মমতাজ সুন্দরী যেখানকার অকথ্য নায়িকা।

গাড়ি চালাচ্ছে এই অতৃপ্ত কামনাময়ী। শ্যাম্পু করা ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল উড়ছে হাওয়ায়। সারি-সারি মিটার থেকে বিচ্ছুরিত আলো পড়েছে তার চিবুকের নিচ থেকে ওপরের দিকে। আলো আর ছায়ায় নিখুঁত কালো মুখটা অপরূপ শুধু নয়, আশ্চর্য লাবণ্যে ভরা বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু পাতলা কাজল ছাওয়া চোখে সে যখন মদির কটাক্ষ হানছে, ঈষৎ স্ফীত নাসারন্ধ্র আর উত্তাল বুকে অবদমিত বাসনাকে জাগ্রত করছে–তখন আর শুধু তাকিয়ে দেখা যায় না তাকে...ইচ্ছে যায়...

ইচ্ছে যায়...

এই প্রবল ইচ্ছেটাকেই প্রবলতম সংযম দিয়ে রুখতে রুখতে চলেছে বেচারা গজানন। খাই খাই মেয়েমানুষদের সামাল দেওয়া যে কঠিন হাড়ে হাড়ে তা মালুম হচ্ছে। একে তো ব্যাচেলার তার ওপর লেডি কিলারদের পাঠশালাতেই পড়েনি। সুতরাং নিজেকে সামলে রাখতে গিয়ে মাথা গরম করে ফেলছে। মাথা গরম হয়ে গেলেই ভায়োলেন্ট হতে ইচ্ছে যাচ্ছে। তাতেও তো সুস্থ বোধ করে গজানন। ভগবান কেন যে মেয়েমানুষ জাতটাকে সৃষ্টি করেছিল। দূর। দূর!

বনের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গাড়িটা চলেছে কোথায়? সতর্ক হয় গজানন।

ভুজঙ্গিনী ভঙ্গিমায় ঘাড় বেঁকায় মমতাজভয় করছে, মিঃ ওয়ান্ডারম্যান?

না। ভাবছি, এতটা পথ আপনিই আবার ড্রাইভ করে হোটেলে ছেড়ে দিয়ে আসবেন তো?

অসুবিধে নেই। রাত জাগার অভ্যেস আছে আমার।

আমার নেই।

একরাশ কাঁচের বাসন ভেঙে গেল যেন। বাব্বা। কি হাসি। বুক ছলাৎ করে ওঠে।

গাড়িটাও ব্রেক কষল সঙ্গে-সঙ্গে–আসুন মিঃ ওয়ান্ডারম্যান, এই আমার কুটির।

গাড়ি থেকে নেমে তাকিয়ে দেখল গজানন। চারপাশে বড়-বড় গাছ। মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা। তার মাঝে একতলা বাড়ি। একদম সাদা। ঠিক যেন ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি।

অন্ধকার যে, মৃদুস্বরে বলে গজানন ইলেকট্রিসিটি নেই?

জেনারেটর আছে। চলুন।

নুড়ি মাড়িয়ে গেট খুলে মমতাজ সুন্দরী গেল আগে-আগে-পেছনে অতি হুঁশিয়ার গজানন। চোখ ঘুরছে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে। যে-কোনও মুহূর্তে একটা বুলেট উড়ে আসতে পারে– গজাননের ভবলীলা সাঙ্গ হতে পারে। বনেবাদাড়ে কে আসছে খোঁজ করতে?

গজানন না জানলেও যে আসবার সে ঠিক এসে গেছিল।

পুঁতিবালা। দূরে গাড়ি রেখে বনের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দ সঞ্চারে ছুটেও এসেছিল। আর...

সতর্ক চাহনি মেলেও গ্রেট গজানন যাকে দেখতে পায়নি তাকে ও দেখেছিল।

আমিনুল হক। সেই ব্রোঞ্জ মূর্তি। অন্ধকারেই চিনেছে পুঁতিবালা। অন্ধকারেই তো চিনবে। অন্ধকারেই তো মানুষ চেনা যায়। অন্তত পুঁতিবালারা চিনতে পারে।

তাই আমিনুল হকের পেটাই মুখাবয়ব দেখেই গা শিরশির করে উঠেছিল পুঁতিবালার। ভয়ে নয়,–রোমাঞ্চে। সুখকর স্মৃতির রোমাঞ্চে!

দূর থেকে চোখ রাখল দুই পুরুষের ওপর। গজানন আর আমিনুল। কালো কষ্টিপাথরটাকে অত না দেখলেও চলবে। হারামজাদী ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠিক নিয়ে এসেছে জিরো জিরোকে। শয়তানি ঢলানি! ফুলে-ফুলে মধু খাও বলে গজাননদাকে ধরে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ?

আর গজাননদা, তোমাকেও বলিহারি যাই। হেরোইন অন্বেষণে এসে মানবী-হেরোইনের ফাঁদে ধরা পড়লে। ও রাক্ষসী তোমাকে যে গিলে ফেলবে।

তবে হ্যাঁ, পুঁতিবালা যখন এসে গেছে–

আলো জ্বলে উঠেছে বাংলোবাড়িটায়। জেনারেটরের আওয়াজ হচ্ছে। আলো জ্বলছে শুধু একতলার ঘরটায়। আমিনুল হক গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে আলোকিত জানলার দিকে।

মরণ আর কী! উঁকি মেরে দেখার শখ হয়েছে। কাল রাতেও কি শখ মেটেনি। মুখে ঝাড় তোমার...

গজানন আর মমতাজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হেরোইনের নেশা বেশ চেপে বসেছে সুন্দরীর মগজে। চোখের আবেশ অতন্দ্র সমুদ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কালো সমুদ্র।

হুঁশিয়ার হয়েছে গজানন। এ মেয়ে এই মুহূর্তে সব করতে পারে।

স্খলিত শাড়ির দিকে নজর নেই মমতাজের। কাঁধের ওপর থেকে কোনওকালে আঁচল খসে পড়ে লুটোচ্ছে পায়ের কাছে। পীবর বুক মিশিয়ে দিয়েছে গজাননের কপাট বুকে।

দুই হাত তার গজাননের দুই কাঁধে। ঠোঁট উঁচিয়ে ধরেছে গজাননের ঠোঁটের কাছে। চোখের তারায় আকুল আমন্ত্রণ।

কিস মি, ওয়ান্ডারম্যান, কিস মি। গলার মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ার চাপা হাহাকার।

গজাননকে এখন একটু অ্যাকটিং করতে হবে। উপায় নেই। এই একটি সূত্র ধরেই তাকে এগোতে হচ্ছে। এখানে না হলে অন্যত্র চেষ্টা চালাবে।

মমতাজ, উত্তমকুমার ঢঙে বললে গজানন। কণ্ঠস্বরটা বেশ গুরুগম্ভীর শোনাচ্ছে। বটে।

হোসেন সাব।

জানি। সাদা গুঁড়ো চাখবে।

আছে–সামান্য।

সামান্য কেন?

আমার কাছে তো থাকে না।

তবে কার কাছে থাকে?

সোজা জবাব দিতে গিয়েও কথা ঘুরিয়ে নিল মমতাজ–

তার কাছ থেকে নিয়ে আসতে হয়। না গিয়েও পারি না। নেশা ধরিয়েছে সে–চালান দেবেও সে–বিনিময়ে নেবে আমার সর্বস্ব।

সে কে?

সে কে? অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে–সে আমার সব।

নাটক রাখো মমতাজ, সামান্য কড়া হয় গজানন–আমি যদি নেশায় পড়ি–পড়তেই তো চাই-ব্যাচেলারের একটা নেশা তো চাই। তখন কে জোগান দেবে আমাকে?

আমি, নিবিড় হয় মমতাজের বাহুবন্ধন। আমি তো জানি। আমার মধ্যে থেকেই তুমি পাবে সব সুখ, সব শান্তি, সব নেশা।

যদি সে চালান বন্ধ করে দেয়?

তোমাকে দিলেও আমাকে না দিয়ে পারবে না। মমতাজের গলার স্বর ক্রমশ আরও মথিত হচ্ছে। চোখের তারায় অমানিশা গাঢ়তর হচ্ছে!

স্বর তীব্র করে গজানন–কেন, তুমি কি তার হাতের পুতুল?

একরকম তাই। নাও, স্টার্ট।...

হাত দিয়ে মমতাজের চিবুক ঠেলে সরিয়ে দিল গজানন–তোমার মতো ব্ল্যাক বিউটিকে হাতের পুতুল করতে পারে–সে কে?

সে যে আমার গড, এক হাত গজাননের কাঁধ থেকে নামিয়ে নিজের শাড়ি ধরে মমতাজ। শক্ত মুঠিতে হাতের কবজি চেপে ধরে গ্রেট গজানন।

তোমার গড তো একজনই–তোমার স্বামী।

গডফাদার...গডফাদার–

ঠিক এই সময়ে ঝপ করে নিভে গেল ঘরের আলো। স্তব্ধ হল জেনারেটরের শব্দ। সবলে গজাননকে জাপটে ধরে জড়িত ভয়ার্ত স্বরে মমতাজ বলে উঠল–নুরুল হাসান এসে গেছে। ও গড।...

সে কী আলিঙ্গন। অন্ধকারে ঝটাপটি। নাগিনীর বাহুপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ প্রয়াস। এরই মাঝে ঘটে গেল অঘটন।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল গজাননের। জ্ঞান হারাল সঙ্গে-সঙ্গে।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে গজানন দেখল, আমিনুল হকের ব্রোঞ্জ মূর্তি ঝুঁকে রয়েছে তার ওপর। গজানন চোখ মেলতেই সরে গিয়ে বসল একটা চেয়ারে। হাতে রিভলভার।

গজানন পড়ে মেঝেতে। মাথার ওপর জ্বলছে আলো, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে জেনারেটরের।

গজানন বললে, কী ইয়ার্কি হচ্ছে? মাথায় মারল কে? আপনি?

হাতের রিভলভারের কুঁদো দেখাল আমিনুল-মুখে কিছু বলল না।

গজানন বললে, ভারি চোয়াড়ে লোক তো আপনি। অমনি করে মাথায় মারে? ভাগ্যিস একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছিলামনইলে দেখতেন খেলাটা।

মাথায় চোট পড়লেই বুঝি আপনি খেলেন ভালো? ক্রুর হেসে বলল ব্রোঞ্জ মূর্তি।

লোকে তাই বলে। তখন আমার আর কিছু মনেই থাকে না।

বটে! বটে! মাথায় চোট পড়লে আর কিছু মনে থাকে না। তাই না?

তাই তো বললাম, মিঃ ফোর টোয়েন্টি।

ফোর টোয়েন্টি। আমি?

তা ছাড়া আর কে?

মমতাজ মাথায় চোট মেরেছিল নাকি?

না তো...।

নিশ্চয় মেরেছিল। তারপর আর কী করেছেন, মনে নেই।

কী করেছি? কী মনে নেই? শঙ্কিত হয় গজানন। মেন্টাল ক্লিনিক থেকে বেরোনোর পর ইস্তক এমন অঘটন তো আকছার ঘটছে। না জানি কী করে ফেলল এখানে। অন্ধকারে

ঝটাপটির সময়ে অবশ্য হাত চালিয়েছিল গজানন–মমতাজও কী হাত চালিয়েছিল? মাথায় কি মেরেছিল?

গুলগুল চোখে তাকায় গজানন–কী হয়েছে বলুন তো?

জানেন না?

এক্কেবারে না?

লায়ার! মিথ্যুক! উঠে পড়ুন। বেচাল দেখলেই গুলি চালাব। ক্র্যাকশট আমিনুল হক নটা মেডেল পেয়েছে গুলি চালানোয়–খেয়াল থাকে যেন।

থাকবে, থাকবে, ভূমিশয্যা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললে গজানন কী করে ফেলেছি, আগে দেখান।

পাশের ঘরের দরজা খোলা আছে। চৌকাঠ থেকে দেখুন, ভেতরে ঢুকবেন না।

তিন পা যেতেই পাশের ঘরের দরজা। উঁকি মারবারও দরকার হল না। বীভৎস দৃশ্যটা অতিশয় প্রকট দরজার বাইরে থেকেই।

মেঝে থেকে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু একটা লাল রঙের ডিভান জাতীয় মখমল শয্যা। তার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে মমতাজ। দু-পা দু-পাশে ছড়ানো। চোখের তারা ভোলা।

ডিপ ব্লু শাড়িটা দিয়ে তার দেহটাকে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টত ওই আবরণ ছাড়া তার দেহে আর কোনও আবরণ নেই।

শিউরে ওঠে গজাননের মতো মানুষও। এই তো কিছুক্ষণ আগে প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত ছিল ছন্দমাধুরীতে ভরা ওই দেহটা।

এইটুকু সময়ের মধ্যে প্রাণপাখি উড়ে গেল দেহপিঞ্জর ছেড়ে। কীভাবে? কেন?

অনুক্ত প্রশ্নের জবাবটা এল পেছন থেকে ধর্ষণ এবং মৃত্যু। জিরো জিরো গজানন, এই একটা চার্জেই আপনাকে আমি ফাসাব।

আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়াল গজানন। চোখমুখ হাত-পা সব প্রশান্ত।

আমি করেছি?

প্রত্যক্ষ প্রমাণ আদালতে হাজির করব।

তেত্রিশ পাউন্ড পেলেও?

পথে আসুন। কিঙ-এর ঠিকানা?

জানি না।

নির্নিমেষে চেয়ে রইল ব্রোঞ্জ মূর্তি ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখেছি মানিব্যাগের মধ্যে।

মানিব্যাগ পেয়েছেন?

কথার জবাব দিল না ব্রোঞ্জ মূর্তি–গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলুন।

টয়োটা?

হ্যাঁ।

চলুন।

জেনারেটর নিভিয়ে দিয়ে গজাননের পেছন-পেছন বেরিয়ে এল আমিনুল হক। জিরো জিরো বোকা নয়। ক্র্যাকশট এবং নটা মেডেল পাওয়া বন্দুকবাজের সঙ্গে চ্যাংড়ামি করতে যাওয়া হঠকারিতা, তা কি সে জানে না!

তা ছাড়া, টয়োটার সিটের তলায় আছে তার পয়েন্ট থ্রি এইট। সিটটায় আগে বসতে হবে, তারপর...

বাড়ি এখন অন্ধকার। টয়োটার পেছনের সিটে আগে উঠে বসল আমিনুল হক। তারপর রিভলভার নির্দেশে সামনের সিটে ওঠাল গজাননকে। দুহাত মাথার ওপর তুলে বসল স্টিয়ারিং হুইলের সামনে। কলের পুতুলের মতো আমিনুলের হুকুম তামিল করে গাড়ি বের করে আনল বনের মধ্যে থেকে। হাইওয়েতে উঠে গাড়ি যখন স্পিড় নিয়েছে, তখন পেছন থেকে বললে আমিনুল-মমতাজের লাশের কাছাকাছি আপনার লাশ ফেলাটা ঠিক হত না। ঘরের মধ্যে রক্ত ছড়াতেও চাইনি। এবার তৈরি হতে পারেন।

আমার অপরাধ। তৈরি হয়েই বললে গজানন। তবে সে তৈরিটা কী ধরনের, আমিনুল যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত...

কুকর্মের সঙ্গী রাখতে নেই, জানেন তো?

ভালো করেই জানি। আমিও একা অপারেট করি।

এবার একাই বেহেস্তে যান। জাহান্নমেও যেতে পারেন।

আমার অপরাধ?

মমতাজকে ধর্ষণ এবং হত্যা।

মিথ্যে কথা।

হেরোইন স্মাগলিংয়ে আপনিও অংশীদার। কিংয়ের ঠিকানা জেনেই আপনি এসেছেন—

মিথ্যে কথা।

মমতাজও সে ঠিকানা জানত বলে আপনি তাকে খুন করেছেন।

এবার এক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে প্রশ্ন করল গজানন–মমতাজ জানত ঠিকানাটা?

আলবত জানত।

আপনিই তাকে ধর্ষণ করেছেন এবং খুন করেছেন–পেট থেকে ঠিকানাটা জেনে নিয়েই–

এতগুলো কথা লিখতে যতটা সময় গেল, তার চাইতে অনেক কম সময়ে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা।

আচমকা ছোট্ট ব্রেক কষল গজানন। আমিনুলের রিভলভারের নলচে ঠেকানো ছিল তার মাথার পেছনে। সামান্য হুমড়ি খেল আমিনুল। নলচে সরে গেল লক্ষ্য থেকে। গজানন এক হাত দিয়ে রিভলভারসুদ্ধ কবজি চেপে ধরল অমানুষিক শক্তি দিয়ে (মাথায় চোট বৃথা যায়নি)–আর এক হাত দিয়ে সিটের তলা থেকে পয়েন্ট থ্রি এইট বের করে সটান গুলি করল আমিনুলের রগ লক্ষ্য করে।

স্টিয়ারিং হুইল ছাড়া গাড়ি তখন এলোমেলোভাবে ছুটছে, পথ থেকে নেমে পড়ছে। একটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মেরে উলটে গেছে।

হাঁচোড়-পাঁচোড় করে জিরো জিরো বেরিয়ে এল ভাঙা দরজার প্রচণ্ড লাথি কষিয়ে। ভাঙা কাঁচে কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। স্টিয়ারিং হুইল বুকে চেপে বসে পাঁজরা গুঁড়িয়ে দেয়নি, এই রক্ষে।

কাঁচ করে একটা গাড়ি ব্রেক কষল পাশে।

থাক, থাক, রিভলভার আর লুকোতে হবে না! এই তো মুরোদ! আমি না থাকলে এতটা পথ যেতে কী করে! নাও, উঠে বসো।

পুঁতিবালা! ডিসিপ্লিন ব্রেক করেছিস। কে তোকে এখানে আসতে বলেছে? তোর চাকরি আর নেই।

নেই তো নেই। ঝটপট উঠে বসো। কে কোন দিক দিয়ে এসে পড়বে। এটা হাইওয়ে।

সুবোধ বালক হয়ে গেল গ্রেট গজানন। গাড়ি উড়ে চলল ফাঁকা রাস্তা বেয়ে। পুঁতিবালার এলো চুল লেপটে যাচ্ছে চোখেমুখে। আজ সে এসেছে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে। পরনে টাইট জিনস প্যান্ট আর শার্ট।

বল, কেন এসেছিস? গর্জে ওঠে গজানন।

তোমার মুরোদ দেখতে, মিটিমিটি হাসছে পুঁতিবালা–ঠিকানা পেয়েছ?

কার?

কিঙের।

না।

হ্যাঁ।

বলছি না।

আমি বলছি হ্যাঁ। আলো নেভবার সঙ্গে-সঙ্গে মমতাজ কী বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল?

তুই সব দেখেছিস?

পেছনের জানলা থেকে।

দ্যাখ পুঁতিবালা, মেয়েটা এত বজ্জাত–

সাফাই গাইতে হবে না, গজানো। তোমার সব খেলাই আমি দেখছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কী নাম বলেছিল মমতাজ?

নাম? নাম?

বলো, বলো, মনে করবার চেষ্টা করো—

মাথায় এমন মারল—

ঠিক তার আগে কী যেন বলে চেঁচিয়ে উঠল?

নু...নু...মনে পড়েছে। পুঁতিবালা, মনে পড়েছে।

নামটা কী?

নুরুল হাসান। বলেছিল, নুরুল হাসান এসে গেছে, ও গড!

নুরুল হাসানই তাহলে মমতাজের গড?

তাই তো দেখছি। ওর স্বামীর নাম—

নুরুল হাসান নয়।

তবে কার নাম?

গজানো, তোমার সাগরেদি করে ব্রেনটাকে কীরকম পাকিয়েছি এবার দ্যাখো। এটা কী দেখছ?

টেলিফোন গাইড।

এই শহরের টেলিফোন গাইড। মমতাজের ওপর যখন ধর্ষণ আর মারধর চালাচ্ছে আমিনুল, আমি তখন–

আমিনুল!

আবার কে? ভারি পাজি লোক। কাল রাতেই আমি বুঝেছি।

কী...কী বুঝেছিস তুই?

সে অন্য কথা। মমতাজকে জঘন্য ভাবে ধর্ষণ করে ওর মুখ থেকেই নুরুল হাসান নামটা বের করে নেয় আমিনুল। হেরোইন মানুষের আগল আলগা করে দেয় বিশেষ করে আন্নাকালীর মতো মেয়েদের

আন্নাকালী!

ওই হল গিয়ে! মমতাজ মানেই আন্নাকালী। গায়ের যা রং–ম্যাগো। যাক যা বলছিলাম, মমতাজের কাছ থেকে নামটা জেনে নিয়ে তাকে অমানুষিক ভাবে পিটিয়ে মেয়ে ফেলে আমিনুল। আমি বাধা দিইনি। অমন মেয়ের ওই দশাই হয়। আমি তখন খুঁজছিলাম টেলিফোন গাইডটা। তারপর পাহারা দিচ্ছিলাম তোমাকে। আমিনুল ট্রিগার টেপবার আগেই টাইট সার্টের বক্ষদেশ থেকে খুদে রিভলভারটা বের করে দেখাল পুঁতিবালা–পৌরুষ উড়িয়ে দিতাম আমিনুলের।

স্যাডিস্ট!

যা খুশি বলো। আমি গাড়ি চালাচ্ছি–দেখতেই পাচ্ছ। তুমি গাইডখানা দ্যাখো। নুরুল হাসান নিশ্চয় বড় দরের লোক। কিঙ-য়ের আসল নাম যদি নুরুল হাসান হয়–টেলিফোন তার নামে থাকবেই। দ্যাখো।

ভালো ছেলের মতো ছুটন্ত গাড়িতে গাইডের পাতা উলটে গেল গজানন। পাওয়া গেল নুরুল হাসানের নাম আর ঠিকানা।

হাসল পুঁতিবালা আমিনুল জানত তুমিও ঠিক এইভাবে পেয়ে যাবে ঠিকানা। তাই বধ করতে চেয়েছিল তোমাকে। দাদা গো, এখন বলো কী করতে চাও।

বধ করব।

কাকে?

কিঙকে।

তবে চলো–এখুনি।

.

হাইওয়ে থেকে একটু ভেতরে বাড়িটা। দোতলা। পেট্রল পাম্পে জিগ্যেস করতেই পাওয়া গেল পথনির্দেশ।

গাড়ি দূরে রেখে ভাইবোন এগিয়ে গেল মরণের টঙ্কার বাজাতে।

দুজনেই এগোল বাড়ির সামনের দরজার দিকে। পেছনে পাহারা থাকতে পারে। সেখানে অন্ধকার। সামনে কেউ থাকবে না। এখানে আলো।

দরজা খোলাই রয়েছে। কোনও গোপনতা নেই। আর পাঁচটা গেরস্থ বাড়ির মতোই। করিডরে জ্বলছে আলো।

চৌকাঠ পেরিয়েছে গজানন, এমন সময়ে পাশের দেওয়ালের খুপরি থেকে একটা ষণ্ডামার্কা লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে।

কী যেন বলতেও গেল। কিন্তু বলবার অবকাশ ছিল না গ্রেট গজাননের। মাথার চোট পেয়ে তখন তার কোষগুলো নিদারুণ টনটনে–

ফলে, এক হাতে তার মুখ চেপে ধরল গজানন, আর এক হাতের ছোট্ট ছুরিটা বসিয়ে দিল তার বুকে।

নিষ্প্রাণ দেহটাকে আস্তে-আস্তে শুইয়ে দিল মেঝেতে।

এবার তার চোখ জ্বলছে। গজানন রক্ত দেখেছে। গজানন রেগেছে।

খুশি হল পুঁতিবালা।

করিডরের শেষে একটা ঘরে কারা যেন কথা কইছে।

পা টিপে টিপে দুজনে এগিয়ে গেল দরজার পাশে।

ভারি গলায় একজন বলছে–মমতাজের ওপর হুকুম আছে গজাননকে পটাসিয়াম সায়ানাইড দিয়ে চলে আসবে এখানে।

শুনেই মাথার চুল খাড়া হয়ে যায় গজাননের। কী নৃশংস মেয়েছেলে রে বাবা! হেরোইনের নাম করে পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ানোর প্ল্যান করেছিল তাকে। পুঁতিবালা কি সাধে বলে আন্নাকালী! ভগবান বাঁচিয়েছেন।

ভারি গলায় আবার বললে-দরজা ভোলাই আছে–মমতাজের এত দেরি হচ্ছে কেন বুঝছি না। কী হে কেমিস্ট, তুমি আর দেরি কোরো না। মাল খাঁটি আছে কিনা টেস্ট করে বলে দাও, ওজন করে ভাগ করে দাও।

ভাঙা গলায় একজন বললে–তাই হোক বস্। দেনাপাওনা এখানেই মিটে যাক। যে যার মাল ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাক। পেছনে ফেউ যখন লেগেছে।

ভারি গলায় বললেকভাগ হবে তাহলে?

সরু গলায় একজন বললে–চার ভাগ। আপনি রাখবেন?

ভারি গলা–না।

সরু গলা–তাহলে তিনভাগ হোক। আমার বাইশ পাউন্ড।

ভাঙা গলা–আমার বাইশ পাউন্ড।

হেঁড়ে গলা–হেঁ-হেঁ, আমারও বাইশ পাউন্ড।

দোরগোড়ায় শোনা গেল বজ্রগর্জন–আমার ছেষট্টি পাউন্ড।

সবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পাঁচটা লোক। প্রত্যেকেই ভীষণ চমকে উঠে তাকিয়ে দরজার ফ্রেম জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কালান্তক যমদূতের মতো মানুষটার দিকে। কে রে বাবা? মানুষ না অসুর? আঁকাল চুল ফুলেফেঁপে বিচ্ছিরি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছে মাথার চারপাশে। চোখ দুটো দু-টুকরো জ্বলন্ত কয়লার মতো গনগনে রাঙা। চাহনিও পৈশাচিক...অমানুষিক।

সবার আগে কিঙ সামলে নিল। দীর্ঘদেহী যে পুরুষ মূর্তি ভারি গলাটা তারই। মাথার সামনে টাক, পেছনে লম্বা চুল। টিকোলো নাক। জমিদারি গোঁফ। রীতিমতো কর্তৃত্বব্যঞ্জক খানদানি চেহারা।

বললে ভারি গলায়–গজানন?

জিরো জিরো গজানন। বলতে-বলতে টেবিলে স্কুপাকার ছেষট্টিটা পলিথিন প্যাকেট দেখে নিল গ্রেট গজানন। সাদা মিহি গুঁড়ো প্রতিটি প্যাকেটে। নিক্তি হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে উঠেছে যে চশমাধারী ভদ্রলোক-ভদ্রলোক মানুষটা, ওই নিশ্চয় কেমিস্ট। না। ওকেও বাদ দেওয়া যাবে না। এ ঘরের সবাই পাজি। তাই এ ঘর ছেড়ে কেউ জীবন্ত বেরোতে পারবে না। এ ঘরের এক কণা সাদা গুঁড়োও ভারতের মাটিতে পৌঁছবে না।

মৃত্যুর দ্রিমি-দ্রিমি ডম্বরুধ্বনি বোধহয় আগেই শুনতে পেয়েছিল ভারি গলার অধিকারী লম্বা লোকটা। একটুও না নড়ে বললে–ওয়েলকাম, মাই ফ্রেন্ড। তিন ভাগ নয়, চার ভাগই হোক।

মহাশয়ের নাম?–গজাননের গলায় কি করাত বসানো? কথাগুলো কানের মধ্যে দিয়ে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে কেন?

নুরুল হাসান।

ওরফে কিঙ।

ইয়েস।

এরপর আর কোনও কথাই হল না ঘরের মধ্যে। শুধু শোনা গেল গুলির শব্দ।

বাইরের হাইওয়েতে সে আওয়াজ পৌঁছেছিল। আতশবাজি পোড়ানো হচ্ছে মনে করেই কেউ কান দেয়নি।

মাত্র পাঁচটা বুলেট খরচ করেছিল গজানন আর পুঁতিবালা। তিনটে জিরো জিরো দুটো তার সাগরেদের।

প্রথম বুলেটটা অবশ্য জিরো জিরোর। কিঙ-য়ের দুই ভুরুর ঠিক মাঝখান দিয়ে করোটিতে প্রবেশ করেছিল গরম সীসের টুকরোটা।

টেবিলের ওপরেই ছিল ব্যাগ। ছেষট্টিটা প্যাকেট তার মধ্যে ভরে বেরিয়ে এসেছিল ভাইবোন স্পাই কোম্পানি।

দিন কয়েক পরেই ত্রিশূল দপ্তরের রামভেটকি সুরকিওয়ালার টেবিলে প্যাকেটগুলো সাজিয়ে রেখে শুধু বলেছিল গজাননসরি, লাশ সাতটা আনতে পারলাম না।

জুয়েল বক্স

জুয়েল বক্স চুরির গল্প এটা নয়। বরং ঠিক তার উলটো। অথচ তা অপরাধ।

নিভা আর নিখিল বিয়ে করেছিল ভালোবেসে। প্রথম দেখায় ভালোবাসা। লেকে বেড়াতে

বেড়াতে প্রথমে চার চোখের মিলন। তারপর আঙুলে-আঙুল ঠেকে জাপানি মন্দিরের ধ্যানী বুদ্ধের সামনে। দ্রিমি-দ্রিমি বাজনার তালে-তালে ওদেরও হৃদপিণ্ড দ্রিমি-দ্রিমি নেচেছিল সেই মুহূর্তে।

পরিণাম যা হয়, তাই হয়েছে। নিভার সীমন্তে সিঁদুর টেনে দিয়েছে নিখিল। তারপর ওই লেক রোডেই একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সংসার পেতেছে।

এই গেল আদি পর্ব।

পরের পর্বে দেখা গেল খিটিমিটি লেগেছে দুজনের মধ্যে। নিভা রূপসি হতে পারে, নিভা চটুলাও হতে পারে, নিভা ময়ুরী হতে পারে কিন্তু নিভার ভেতরে আছে এমন কয়েকটা বদ বাতিক, যা নিয়ে সুখী হওয়া যায় না। সেই সঙ্গে আছে প্যানপেনে কান্না। যখন তখন।

দুদিনেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে নিখিল। মনের রং ছুটে গেল কয়েক মাসেই। তারপর পালাই পালাই রব উঠল মনের কোণে কোণে।

এবার আসা যাক শেষ পর্বে।

এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছল নিখিলের গাড়ি। ইঞ্জিন বন্ধ করতেই ফোঁসফোঁস করে ফের কেঁদে উঠল নিভা। নিখিলের মনে হল, প্রচণ্ড ক্রোধে বুঝি ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। অতি কষ্টে সামলে নিল নিজেকে।

বলল, নিভা, মনকে ঠিক কর। মায়ের ডাকে যাচ্ছ মায়ের কাছে এক মাস জিরেন নিতে। প্রথমে লাফিয়ে উঠেছিলে যাওয়ার জন্যে–তারপর বেঁকে বসলে না যাওয়ার জন্যে। এখন আবার শুরু করলে কান্নার সেই ঘেঁদো নাটক। কী চাও? যাবে, না যাবে না?

আ-আমি যাব...না, যাব না।ফোঁপানির মধ্যেই নিভা যা জানাল তার কোনও মানেই হয় না।

হাল ছেড়ে দিল নিখিল। একী গেরো রে বাবা! মাথা হেলিয়ে দিয়ে কটমট করে চেয়ে রইল গাড়ির ছাদের দিকে। সেকেন্ড কয়েক পরেই ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো হঠাৎ সিধে করল শিরদাঁড়া– টংকার শোনা গেল কস্তু কণ্ঠে।

নিভা তুমি যাচ্ছ। গেট রেডি।

ঘটাং করে দরজা খুলে নেমে পড়ল নিখিল। গাড়ির পেছনে গিয়ে আরও জোরে শব্দ করে খুলল ট্রাঙ্কের ডালা। কুলি সামনেই দাঁড়িয়েছিল রামভক্ত হনুমানের মতো। হেঁকে বলল নিখিল, দুটো সুটকেশ। বোম্বাই ফ্লাইট। জলদি।

আমার জুয়েল বক্স? গাড়ির ভেতর থেকে যেন আর্তনাদ করে উঠল নিভা।

পেছনের সিটে ব্রিফকেশের মধ্যে। মনে নেই গতবার দিল্লি থেকে জুয়েল বক্স কোলে নিয়ে ফেরবার পর কী কাণ্ড ঘটেছিল? জুয়েলভরতি বক্স সিটে রেখেই তো নেমে এসেছিলে। এবার তাই ব্রিফকেসের মধ্যে রইল তোমার সাধের রত্নবাক্স। বুঝেছ? রেগে তিনটে হয়ে বলল নিখিল।

কুলি ইতিমধ্যে সুটকেশ দুটো বগলদাবা করে এগিয়েছে। নিখিলও গেল পেছনে। কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার আগে পেছন ফিরে দেখল গাড়ির মধ্যে বসে তখনও রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে নিভাননী ওরফে নিভা।

ডিসগাস্টিং! বলেই সামনে ঘাড় ফেরাল নিখিল। কাঁচের কপাটে প্রতিফলিত আপন মুখচ্ছবি দেখে নিজেই চমকে উঠল। কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছে সে মুখ।

নিভার হাতে টিকিট গছিয়ে দিয়ে নিখিল বললে, তোমাকে আর একটা জিনিস দিতে বাকি রইল। তোমার রত্নবাক্সর চাবি। এই নাও। বলে রূপোর চেনে গাঁথা সোনার চাবিটা নিভার গলায় লকেটের মতো ঝুলিয়ে দিল নিখিল। এতক্ষণ দিইনি হারিয়ে ফেলবে বলে। জুয়েল বক্স খুলবে বাড়ি গিয়ে–বোম্বাইতে। তার আগে নয়। কেমন? দু-হাতের মধ্যে নিভার শ্যামল মুখশ্রী কাছে টেনে নিল নিখিল। এদিক-ওদিক দেখে টুক করে মুখ চুম্বন করে বলল, বিদায় ডার্লিং, বিদায়।

আবার কেঁদে উঠল নিভা। বিদায়কালীন শেষ চুম্বনে কী জাদু ছিল কে জানে, নিভা আর নিজেকে রুখতে পারল না। লাজলজ্জা ভুলে গলা জড়িয়ে ধরল নিখিলের।

একরকম জোর করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নিখিল। ঠেলে দিল নিভাকে দণ্ডায়মান উড়োজাহাজের দিকে। কাঁদতে কাঁদতে এগুলো নিভা। এয়ারপোর্টের জোর হাওয়ায় নিশানের মতো উড়তে লাগল ওর ব্লু জর্জেটের আঁচল।

শেষদৃশ্য–বলল নিখিলের মন।

.

কয়েক মিনিট পর।

গাড়িতে এসে বসল নিখিল। মনটা বলাকার মতো পাখা মেলে উড়ে যেতে চাইছে সুনীল গগনে। মুক্তি! মুক্তি! চিরমুক্তি!

ইঞ্জিন গর্জে উঠেছে। ওর এক্সপার্ট হাতের মোচড়ে প্রবল পাক খেয়ে গাড়ি ছুটেছে এয়ারপোর্টের বাইরে। ভি-আই-পি রোডে এসে সিগারেট নিতে সামনের খোপে হাত দিল নিখিল। হাতে ঠেকল একটা ভাজ করা কাগজ।

লাল কাগজ। চিঠি। লিখেছে নিভা।

প্রিয়তম,

আমি জানি তুমি আর আমাকে চাও না। কিন্তু বিশ্বাস কর আর নাই কর– আমি তোমাকে ভালোবাসি। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে তোমাকে আর দেখতে পাব কি না জানি না। কিন্তু আমার ভালোবাসার চিহ্ন স্বরূপ তোমার দেওয়া জুয়েল বক্স তোমাকেই দিয়ে গেলাম। ফের যদি বিয়ে করতে মন চায় তো আমার সতীনকে দিও।

নিভা।

আঁতকে উঠল নিখিল। জুয়েল বক্স! গাড়ির মধ্যে!

ব্রেক কষল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কোথায়...কোথায় সেই জুয়েল বক্স?

সময় নেই...আর সময় নেই...নিজের হাতে জুয়েল বক্সের মধ্যে টাইম ফিউজ বোমা রেখেছে নিখিল...উড়ন্ত অবস্থাতেই যাতে প্লেন ফেটে উড়ে যায় যাতে প্লেনের মধ্যে নিভাননীর নরম তনুটা ছিঁড়ে পুড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে যায়–তাইতো তার সাধের রত্নবাক্সের মধ্যে টাইমবোমা রেখেছিল নিখিল। তারিফ করার মতো বউ নিধনের পরিকল্পনা কি শেষে বুমেরাং হয়ে যাবে? জুয়েল বক্স ফাটবে তারই গাড়ির মধ্যে–সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হবে নিখিল?...

কোথায় জুয়েল বক্স? কোথায় সেই অভিশপ্ত জুয়েল বক্স? বি

দ্যুৎ চমকের মতো এতগুলো ভাবনা ঝলসে উঠল মনের আকাশে। বি

স্ফোরণটা ঘটল সঙ্গে-সঙ্গে।

গাড়ি আর নিখিলের দেহ অনেক টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল রাস্তার দুপাশে।

দাঁত থাকতে

শুকনো মুখে অনিতা জানলা দিয়ে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। মুখ দেখে কে বলবে মাত্র বারো ঘণ্টা আগে ময়দানের অন্ধকারে নরপশুদের শিকার হতে হয়েছিল তাকে।

অনিতার বাবা রোটারিয়ান শশাঙ্ক সান্যাল পাকা গোঁফে তা দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, ইন্দ্রনাথবাবু, আমি সেকেলে হলে কী হবে, মেয়ে বড় হচ্ছে পারমিসিভ সোসাইটির হাওয়ায়। ছেলেমেয়ের মধ্যে মেলামেশা আমিও দোষের মধ্যে দেখি না। কালকে ও অজিতকে নিয়ে গিয়েছিল বেড়াতে। ভিক্টোরিয়ার উলটোদিকে প্যারেড গ্রাউন্ডে সি এম ডি এ যেখানে পাতালরেলের কাজ চালাচ্ছে সেইদিকে। তারপর কী হয়েছে অনিতার মুখেই বরং শুনুন। আমি বাইরে যাচ্ছি।

জুতো মসমঁসিয়ে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধ শশাঙ্ক সান্যাল। লম্বা, রোগা, খানদানি চেহারা। এই বয়সেও আদ্দির পাঞ্জাবি গিলে করে পরেন, ধুতি চুনোট করেন, হাতে মালাক্কা বেতের ছড়ি নিয়ে হাঁটেন। বারান্দায় দেশলাই ঘষার আওয়াজ হল। চুরুটের গন্ধ পেলাম।

অনিতা জানলা দিয়ে ঠায় তাকিয়ে ছিল বাইরে। বাবা বাইরে গেলেন। ঘরে আমরা দুজন সদ্য পরিচিত পুরুষ–অথচ একবার ফিরেও তাকাল না কাল রাতের ভয়াবহ ওই অভিজ্ঞতায় স্নায়ু চোট খেয়েছে নিশ্চয়–বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

নরম গলায় ইন্দ্র বললে, অনিতা।

অনিতা ফিরে তাকাল। অষ্টাদশী সুন্দরী, লাবণ্যময়ী। ধারাল মুখ। ঠোঁঠে শুষ্ক হাসি টেনে এনে বলল, বলুন।

তুমি বলছি বলে রাগ করছ না তো?

না, না।

অজিত কে অনিতা?

স্মার্ট মেয়ে বটে। একটু দ্বিধা না করে বললে, কলেজ ফ্রেন্ডলাইফ পার্টনার করব ভাবছি। কিন্তু এই কাণ্ডটা হয়ে যাওয়ার পর–

কী হয়েছিল, খুলে বলবে?

চোখ ফিরিয়ে ফের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল অনিতা।

মাত্র আঠারো বছর বয়স, কিন্তু তিনগুণ বয়সের পুরুষকেও আকর্ষণ করার মতো উপাদান শরীরে জড়ো হয়েছে। সোনা-সোনা রঙের ঘাড়-ছাঁটা এক মাথা চুল, ঠোঁটের ভঙ্গিমায় আদুরে-আদুরে ভাব, বুটিদার হলুদ ঢিলেহাতা পাঞ্জাবি আর বেগুনি স্ন্যাকসের দৌলতে অষ্টাদশী সৌন্দর্য বেশ প্রকট।

একটু ধার-ঘষা গলায় বললে, নিউ এম্পায়ারে ইভিনিং শো-তে এক্সরসিস্ট দেখে আমি আর অজিত গিয়েছিলাম ময়দানে–আমার স্কুটারে।

তুমি স্কুটার চালাও?

হ্যাঁ। অজিত অসভ্য রকমের লম্বা বলে ও-ই চালিয়ে নিয়ে গেল।

কত লম্বা?

চোখ ফিরিয়ে তাকাল অনিতা। এই প্রথম ওর ক্লান্ত চোখে দুষ্ট ঝিলিক লক্ষ করলাম, বললে বিশ্বাস করবেন না। সাত ফুট দুইঞ্চি।

সাত ফুট দুইঞ্চি!

লং মেন্স ক্লাবের ও ফাউন্ডার সেক্রেটারি।

কী ক্লাব বললে?

এবার হেসে বলল অনিতা।

বললে–লং মেন্স ক্লাব–লম্বা লোকদের ক্লাব। কলকাতায় এই প্রথম। অজিত নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে।

হাঁ করে শুনছিল ইন্দ্রনাথ, ঠিকানাটা দিও তো। দেখব আমার ঠাঁই হয় কি না।

ওর তালঢ্যাঙা চেহারার পানে তাকিয়ে অনিতা বললে, তা হবে। সাত বাই তিন, কৈলাশ মুখুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা সাত।

ঠিকানাটা লিখে নিল ইন্দ্রনাথ। আবহাওয়া বেশ লঘু হয়ে এসেছে লম্বা লোকদের ক্লাব প্রসঙ্গে আসায়। মুচকি হেসে বললে, তোমার লম্বা হবু লাইফ পার্টনার স্কুটার চালিয়ে গেল ময়দানে। তারপর?

আবার চোখ ফিরিয়ে নিল অনিতা। চঞ্চল হল আঙুলগুলো।

সেকেন্ড কয়েক চুপ করে থেকে বলল, মাটি কেটে পাহাড়ের মতো যেখানে ঢেলে রাখা হয়েছে, তার আড়ালে বসেছিলাম ঘণ্টাদেড়েক। ওদিকে আলো নেই। কয়েকটা গাছের ঘুপসি জটলা। হঠাৎ কথা আটকে গেল অনিতার।

নরম গলায় ইন্দ্র বললে, লজ্জা করো না, বল আমার শোনা দরকার।

হঠাৎ অজিত ভীষণ চেঁচিয়ে উঠল, কে? কে? সঙ্গে-সঙ্গে কারা যেন মাটির ঢিবি বেয়ে হুড়মুড় করে লাফিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। দমাস করে একটা আওয়াজ শুনলাম– অজিত ককিয়ে উঠল। আমাকে কয়েকজন চক্ষের নিমেষে ধরে মুখ, চোখ, হাত, পা বেঁধে ফেলল। চেঁচাতেও পারলাম না। তারপর–দু-চোখ বন্ধ করল অনিতা। আর কথা বলতে পারছে না। ঠোঁট দুটো কেবল থরথর করে কঁপছে।

ইন্দ্রনাথ বললে, যাক আর বলতে হবে না। কাউকে দেখোনি?

তারার আলোয় দেখেছিলাম, কিন্তু কিছু মনে পড়ছে না। চোখ বেঁধে ফেলার আগে কিন্তু কাউকে দেখিনি।

তবে কখন দেখেছিলে?

অনেকক্ষণ পরে...গোঙাচ্ছিলাম...চোখের বাঁধন খুলে দিল...অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে একজন আমাকে...কিন্তু কিছুতেই তার মুখটা মনে করতে পারছি না।

তুমি তাকে দেখেছিলে? ঝুঁকে পড়ল ইন্দ্রনাথ। দুই চোখ খরখরে।

হ্যাঁ। কিন্তু আমি তখন..আমি তখন...তারপর আর কিছু মনে নেই।

ঠোঁট কামড়ে মাথা নীচু করে রইল ইন্দ্রনাথ। শক্ত হয়ে উঠল চোয়ালের হাড়।

বললে, তারপর?

চলন্ত ট্যাক্সির পেছনে জ্ঞান ফিরল। অজিতের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলাম।

অজিত জখম হয়েছিল?

গাল কেটে রক্ত পড়ছিল। রুমাল দিয়ে চেপেছিল। একা বলে অতজনের সঙ্গে পারেনি।

মৃগ, শশাঙ্কবাবুকে ডাক।

উঠে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলাম শশাঙ্ক সান্যালকে। চুরুট কামড়ে ধরে স্বভাবতী কণ্ঠে বললেন, স্কাউন্ডেলদের কি ধরা যাবে না, ইন্দ্রনাথবাবু?

সম্ভব নয়। অনিতা তো কাউকেই মনে করতে পারছে না। অজিত কি কাউকে দেখেছে?

না। ওরও চোখ, হাত, পা, মুখ বাঁধা ছিল।

একটা উপায় আছে–শেষ চেষ্টা করতে পারি।

বলুন।

বলল ইন্দ্রনাথ। চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল শশাঙ্ক সান্যালের, এও কি সম্ভব?

খুবই সম্ভব।

বেশ ব্যবস্থা করুন।

.

সম্মোহন চিকিৎসক হিমাংশু দলুইয়ের চেম্বারে পৌঁছলাম সন্ধেবেলা।

উনি পথ চেয়ে বসেছিলেন। অনিতাকে একটা ইজিচেয়ারে আড় করে শুইয়ে দিলেন। ঘরে নরম আলো জ্বেলে দিলেন। তারপর ময়দানের কাহিনি আর একবার শুনলেন।

চেনে ঝোলানো চকচকে একটা চাকতি বার করে বললেন, সম্মোহন এবার শুরু হবে। আপনারা দয়া করে–

উঠে পড়লাম আমি, ইন্দ্রনাথ আর শশাঙ্কবাবু। বসলাম বাইরের ঘরে।

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক পড়ল আমাদের। অনিতা আড় হয়ে শুয়ে। এইমাত্র সম্মোহিত হয়েছে বলে মনেই হয় না।

ডাক্তার বললেন, পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছে ওকে হিপনোটাইজ করতে। এত সময় কখনও লাগে না। যে হিপনোটাইজড় হবে, সে যদি সহজ হতে না পারে, দেরি হবেই।

অনিতার আর দোষ কী বলুন, সহানুভূতির স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ। শেষ যাকে দেখেছিল, তার চেহারা কি মনে করতে পেরেছে?

তা পেরেছে।

উৎসুক হল অনিতা নিজেও। আমরা তো বটেই।

ডাক্তার একটা সাদা কাগজ টেবিল থেকে নিয়ে চার ভাঁজ করে ইন্দ্রনাথের হাতে দিলেন।

ভাঁজ খুলে পড়ল ইন্দ্রনাথ। ফের ভাঁজ করে পকেটে রেখে বলল, চল মৃগ, অজিতকে জিগ্যেস করে আসি তার আবার কাউকে মনে পড়ে কি না।

.

লং মেন্স ক্লাবেই পাওয়া গেল অজিত সামুইকে।

আখাম্বা লম্বা বটে চেহারাখানা। গায়ে সে অনুপাতে মাংস বা চর্বি খুব কম। দড়ির মতো পাকানো হাত আর পা। চোয়ালের হাড় আর গালের হনু ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ঘরের একটিমাত্র টেবিলে বসে ঘাড় হেঁট করে কী লিখছিল, আমি আর ইন্দ্রনাথ ঢুকতেই প্রথমে চোখ তুলল–তারপরেই সটান উঠে দাঁড়াল। লক্ষ করলাম বাঁ-গালে একটা স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো।

আপনারা?

পেশায় আমি ডিটেকটিভ, নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। আর ইনি হলেন আমার ডক্টর ওয়াটসন। মৃগাঙ্ক রায়, বলে তক্তপেপাশে বসতে-বসতে বললে ইন্দ্র, আপনার কাছে কেন এসেছি বুঝতেই পারছেন। অনিতা কাউকেই মনে করতে পারছে না। আপনি কি পারবেন?

অসম্ভব। ওই অন্ধকারে আচমকা ঘাড়ে এসে না পড়লে বাছাধনদের টের পাইয়ে দিতাম।

আপনাকেও বেঁধে ফেলেছিল শুনলাম।

আষ্টেপৃষ্ঠে।

মার খাওয়ার পর?

মেরেছি আমিও, গালের স্টিকিং প্লাস্টারে হাত বুলিয়ে নিল অজিত। প্রথম ঘুসিটা সামলাতে পারিনি।

গাল থেকে রক্ত ঝরছিল কেন?

কামড়ে দিয়েছিল যে।

কামড়ে দিয়েছিল! বলেন কী?

একজনকে জাপটে ধরেছিলাম। এমন কামড়ে ধরল যে—

ছেড়ে দিলেন। কে কামড়েছিল দেখেননি?

বললাম তো ওই অন্ধকারে–

এক কাজ করুন। আমার সঙ্গে স্পেশ্যালিস্টের কাছে চলুন। কামড়ের দাগ দেখে দাঁতের চেহারা তিনি বার করে ফেলবেন। কিছুটা সাহায্য তাতে হবে। দাগি ক্রিমিন্যাল হলে ধরা যাবে।

চোখ কুঁচকে তাকাল অজিত, কামড়ের দাগ থেকে দাঁতের চেহারা বার করা যায়?

নিশ্চয় যায় অজিতবাবু। বিজ্ঞানে সব হয়। ফোরেনসিক ওড়োনটোলজির নাম শোনেননি বোধ হয়?

না।

ক্যালকাটায় ওজা◌েনটোলজিস্ট একজনই আছেন। ডাক্তার বিমল ভটচাজ। আমার বিশেষ বন্ধু। আসবেন?

চলুন।

দাঁতের কামড়ের বিশেষজ্ঞ শেষ পর্যন্ত কী রিপোর্ট দিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথকে, আমার তা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এ-কেসে যে শেষ পর্যন্ত বন্ধুবরকে মুখে চুনকালি মাখতে হবে, তা বুঝে আমিও আর খুঁচিয়ে কিছু জিগ্যেস করিনি। দিন কয়েক পরে সস্ত্রীক বসে কফি পান করছি, এমন সময় ঘরে ঢুকল ইন্দ্রনাথ, পেছনে শশাঙ্ক সান্যাল।

নমস্কার-টমস্কার শেষ হওয়ার পর শশাঙ্কবাবু বললেন, মৃগাঙ্কবাবু, মিসেস রায়, আপনারা দুজনেই এগারোই আষাঢ় আমার পর্ণ কুটিরে পায়ের ধুলো দেবেন। এই রইল পত্র।

বলে একখানা ভারী হ্যান্ডমেড পেপারের হলুদ রঙের খাম রাখলেন টেবিলে। খামের ওপরে বাহারি ছাঁদে লেখা শুভবিবাহ।

কার বিয়ে? নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল কবিতা।

আমার মেয়ের।

অনিতার? আমি হতভম্ব। পাত্র কে?

অজিত।

অজিত!

উঠে পড়লেন শশাঙ্কবাবু, বড় ভালো ছেলে। চলি আজ। আসবেন কিন্তু।

ইন্দ্রনাথ দরজা পর্যন্ত শশাঙ্কবাবুকে এগিয়ে দিয়ে এসে বসল কবিতার পাশে। ধীরে-সুস্থে একটা কচি ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, কফিটা কি না চাইলে দেবে না?

কবিতা শুনেছিল অনিতা কাহিনি। তাই হাঁ করে চেয়েছিল ইন্দ্রনাথের পানে। এখন ঘোর সন্দেহ দেখা দিল চাহনির মধ্যে। সন্দেহ আমারও হল। ইন্দ্রনাথ জানে এই হঠাৎ বিয়ের রহস্য।

শক্ত গলায় বললে কবিতা, কফি পরে। আগে বল সব জেনেশুনে অনিতাকে অজিত বিয়ে করছে কেন? ভালোবেসে?

তা তো বটেই। ঘটকালিটা অবশ্য আমাকেই করতে হয়েছে। একটা কথা বলতেই রাজি হয়ে গেল অজিত।

কী কথা?

বললাম অজিতবাবু, আমি সব জানি। শশাঙ্কবাবু বা অনিতা কোনওদিন জানতে পারবে না। যদি আপনি অনিতাকে বিয়ে করেন সামনের লগ্নেই।

চোখ বড় বড় করে কবিতা বললে, ঠাকুরপো, তুমি কি বলতে চাও অজিত—

আরে হ্যাঁ। বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্ল্যান করেছিল। বিকৃতি আর কাকে বলে?

কী বলছ তুমি।

ঠিকই বলছি বউদি। একলকাতায় এরকম অসম্ভব কাণ্ড নিত্য ঘটছে, কে তার খবর রাখে। অনিতা-অজিতের প্রেমে খাদ নেই। কিন্তু অজিত অন্য রসের সন্ধানে এই প্ল্যান করেছিল। যাকগে সেসব নোংরা ব্যাপার। যখনি শুনলাম, হিপনোটাইজড় হতে অনিতা পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় নিয়েছে, তখনি বুঝলাম ওর অবচেতন মনে পুরুষটার চেহারা চাপা পড়ে রয়েছে এবং অবচেতন মনের কারসাজিতেই সম্মোহিত হয়ে তাকে সে ধরিয়ে দিতে চাইছে না। ভেতর থেকে ইচ্ছা না থাকলে, কখনওই সম্মোহিত হওয়া যায় না। অবচেতন মনের কারচুপির খবর সজ্ঞান মন পর্যন্ত পোঁছয় না বলেই অনিতা সজ্ঞানে চেষ্টা করেও অজিতের চেহারা মনে করতে পারেনি।

কিন্তু সম্মোহিত হয়ে সে বললে, ভীষণ লম্বা একটা লোক, অনেকটা অজিতের মতো চেহারা, তাকে চেপে ধরেছিল। তখন সে তার গলা কামড়ে দেয়।

ক্লু পেয়ে গেলাম। অজিতকে নিয়ে ওজা◌েনটোলজিস্টের কাছে গেলাম। কামড়ের ক্ষতচিহ্নে দাঁতের যে ছাপ পাওয়া গেল, তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল অনিতার দাঁতের ছাপ। হিপনোটাইজ করিয়ে যা আঁচ করেছিলাম ওডোনটোলজিস্ট দিয়ে তা প্রমাণ করলাম। কিন্তু কোর্টে গেলাম না।

কেন গেলে না? ওই রকম একটা জানোয়ারকে তেড়ে উঠল কবিতা।

বউদি, বিয়ে ভাঙা সহজ, দেওয়া কঠিন। তাছাড়া আমরা চোর-ডাকাত ধরি সংসারকে সুন্দর করার জন্যে, মানুষকে সুখী করার জন্যে। তাই নয় কি? অনিতা বা শশাঙ্কবাবু কেউই কোনওদিন জানবে না অজিত প্রথমে পৈশাচ বিয়ের পর ব্রাহ্ম বিয়ে করেছে অনিতাকে।

পৈশাচ বিয়ে? ভুরু তোলে কবিতা।

তা ছাড়া আর কী? নিউ এম্পায়ার থেকে বেরোনোর আগে দুজনেই যে একটু সুরাপান করেছিল। পারমিসিভ সোসাইটি তো-অনিতা পরে স্বীকার করেছিল আমার কাছে।

গল্পের শেষে আপনাদের একটা খবর জানিয়ে রাখি। ভারতে এই প্রথম সম্মোহন আর দাঁতের ছাপ দিয়ে অপরাধী সনাক্ত করল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।